৯ জানুয়ারি ১৯৮৫ ☐ আনন্দবাজার প্রকাশন ☐ তিন টাকা

আনন্দমেলা

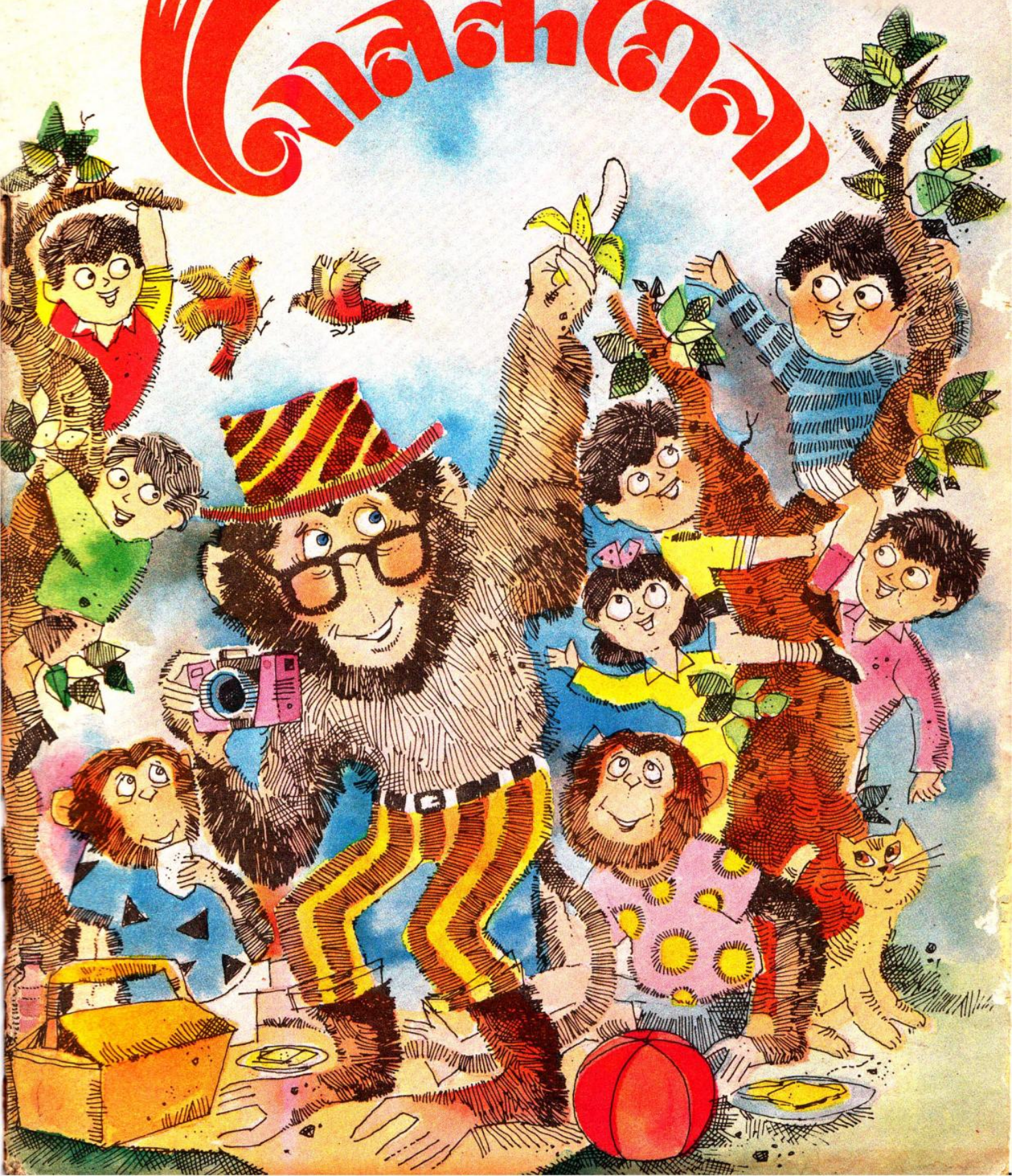

পেনাল্‌টি

গ্যালারীতে ছিলেন দাদু, যেন ভিজে বেড়ালটি
হঠাৎ দারুণ লাফিয়ে উঠে হেঁকে বলেন, পেনাল্‌টি
অম্‌নি এমন কান্ড বাধায় ছোকরারা সব তুলকালাম
রেফারিটি বাজিয়ে বাঁশী বলেন, বাবা, থামরে থাম ।
খেলা এখন শেষের পথে, বল রয়েছে মাঝ মাঠেই
কোন আক্কেলে বল্‌তো দাদা পেনাল্‌টি কিক্ মারতে দেই ?
সবাই তখন ঘাবড়ে গেল, সত্যিই তো ঠিক কথাই
ফাউল টাউল কিচ্ছুটি নেই, ওঠে না এ প্রশ্নটাই ।
বাগিয়ে ছাতা, লাফিয়ে দাদু, রেগে ভোলেন দিগ্বিদিক,
বুদ্ধু যত, নিচ্ছ মেনে ? ভাবছ মনে এটাই ঠিক ?
দেখলে না ঐ সূয্যি ব্যাটা করলে ফাউল অবিশ্রাম !
আহা কচি প্লেয়ারগুলোর দরদরিয়ে ঝরলো ঘাম !
হিসেব করে দেখলে কি কেউ এনার্জি ক্ষয় ক'বাল্‌টি
শুক্‌নো ত্বক আর ঝলসানো মুখ, তবুও কি নয় পেনাল্‌টি ?
এই না বলে দাদু 'ফায়ার', বের করেন এক সবুজ টিউব
হাতে মুখে লাগা তোরা, বুড়ো হলেও নই বেকুব !
রোদের ক্ষতি পূরণ হবে, জিতবেই ঠিক আসছে দিন
ছেলেখেলা নয়কো বাবা ! এর নাম হুঁ বোরোলীন !

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

GDP-5241

আনন্দমেলা

২৫ পৌষ ১৩৯১ ▯ ৯ জানুয়ারি ১৯৮৫ ▯ ১০ বর্ষ ১৪ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
ব্যাপারটা তাজ্জব। শৈলেন ঘোষ ৩৭
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৯
কালো পর্দার ওদিকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৯
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও। অরূপরতন ভট্টাচার্য ৬
গল্প
রাধামাধবের সম্পত্তি। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৩
মেজদার সঙ্গে যাত্রা দেখা। চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ২২
মূর্তি-রহস্য। মালতী দণ্ডেকর ৫১
কবিতা ও ছড়া
মন-ভাল-করা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১১
বাবুইবাবু। শ্যামলকান্তি দাশ ১২
নিপাতনে সিদ্ধ। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
শীতের ছড়া
শীতে কে প্রথম। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৩৫
শীত এসেছে। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৫
এই মাসে। সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ ৩৫
শার্লক হোম্‌সের গল্প
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ। সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫
ভ্রমণকাহিনী
নন্দনপুরী ব্যাঙ্কক। অজিতকুমার ঘোষ ৩২
লেখাপড়া
অর্থ জানো (ফার্সি দুশমন)। দেব-সেনাপতি ৭
সহজে ইংরেজি (আলিপুরের বাগানে)। প্রসাদ ৭
খেলাধুলো
ইংরেজদের দিল্লি দখল। অশোক রায় ৬২
লয়েডের পকেটে অস্ট্রেলিয়া। রাজা গুপ্ত ৬৩
কলকাতায় জাতীয় বক্সিং। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
ভারত তলানিতে ঠেকল। নৃপতি চৌধুরী ৬৫
দু' নম্বররা চ্যাম্পিয়ন। সম্রাট রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৭, টারজান ৩৬
সদাশিব ৪৮, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৫৪, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
জংলি হাতির গল্প। প্রবীরকুমার রায় ৩১
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : দেবাশিস দেব

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

এমন উপহার ওদের দিন যা ওদের সাথেই স্বপ্ন দেখে বড় হয়

চিলড্রেনস গিফট প্ল্যান ইউনিটস

আপনার ছেলেমেয়েদের ইউনিট কিনে দিন। ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১০ এর গুনিতকে যে কোন সংখ্যার আপনার খুশীমতন। তাদের ইউনিটের সাথে সাথেই তারা বড় হয়ে উঠবে, তাদের স্বপ্ন সত্যি হবে।

ছেলে বা মেয়ের বয়স ২১ হয়ে গেলেই বা মেয়েদের বয়স ১৮ ছুলেই হাতে আসবে এক থোক টাকা। আর ঠিক সেই সময়েই ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পড়ে মূলধনের।

আরো একটা বিস্ময় উপহার: নির্দিষ্ট কিছু দিন পর পর সৌভাগ্য লটারী তাদের সামনে এনে দেয় বামপার ক্যাশ পুরস্কার লাভের সুযোগ।

এটা একটা বাড়তি বোনাস। স্বপ্ন সত্যি হয় ইউনিটে

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)
প্রধান কার্যালয় : বোম্বাই ৪০০ ০২০
আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২৩-৮৮১৮, ২২-৮৭৯৫

S 118 s UTI 080/83/BEN

সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে

অঘটন আজও ঘটে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মাসটা ছিল ডিসেম্বর। সাল ১৯৩৮। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এক মাছধরা জাহাজের জালে উঠে এল পাঁচ ফুট লম্বা বিশাল এক মাছ। অমন মাছ জেলেরা কেউ জন্মে দেখেনি। ইস্পাতের মতো নীল তার গায়ের রং। উজ্জ্বল নীল মণির মতো দুটো চোখ। পাখনাগুলো বেজায় বড়-বড়। কচ্ছপের গোদা-গোদা ঠ্যাঙের মতন পা।

জল ছেড়ে ওঠার পর মাত্র ঘণ্টা চারেক বেঁচেছিল। ক্যাপ্টেন আঁচ করেছিলেন, এ যে-সে মাছ নয়। জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট-লণ্ডনের ঘাটে ভেড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাপ্টেন জাদুঘরের অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠালেন।

জাদুঘরের অধ্যক্ষ মিস্ ল্যাটিমের এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। তাঁরও মনে হল, এ এক আজব ধরনের মাছ। চামড়া বাঁধাইয়ের কারিগর ডেকে ছাল ছাড়িয়ে তাকে একটা আস্ত মাছের চেহারা দেওয়া হল। থাকার মধ্যে ছিল কিছু হাড়গোড় আর মাথার খুলি।

মাছটাকে কদর দিয়েছিলেন মিস্ ল্যাটিমের। তাই সেই মাছের নাম দেওয়া হল **ল্যাটিমেরিয়া**।

যথাসময়ে খবর পেয়েও আসতে পারেননি মৎস্যবিদ্ অধ্যাপক স্মিথ। তবে উনিই বলেছিলেন মাছটাকে বাঁধিয়ে রেখে দিতে। এরপর যখন উনি এলেন, মাছ দেখে তো ওঁর চক্ষুস্থির।

আরে, এ যে সিলাকান্থ মাছ! সিলা বলতে ফুটো, কান্থ বলতে কাঁটা।

অধ্যাপক স্মিথ তখন হায়-হায় করতে লাগলেন। ইশ্, ওরা যদি জানত যে, তিরিশ কোটি বছর আগে সমুদ্রে বাস করত যে জাতের মাছ, এতদিন পরেও জ্যান্ত সেই মাছ ধরা দিয়েছে জেলেদের জালে, তাহলে মাছের এতটুকু অংশও ওরা ফেলে দিত না।

যাক, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন আর তার চারা নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে স্মিথ এও মনে করলেন যে, ও-মাছ একটি যখন মিলেছে, তখন আরও হয়তো মিলতে পারে।

এই ভেবে চারিদিকে তিনি ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দিলেন। বিলি করলেন কান্‌কো-পাখনাওয়ালা সিলাকান্থ মাছের ছবিসুদ্ধু তিন ভাষায় হ্যাণ্ডবিল। সেইসঙ্গে ঘোষণা :

পুরস্কার ! পুরস্কার ! পুরস্কার !
জিতে নিন প্রতি মাছে ২০,০০০ পাউণ্ড

এই চেহারার মাছ ধরতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে জানান। কাটাকুটি নয়, আঁশ ছাড়ানো নয়। ধরেই ঠাণ্ডা ঘরে রাখুন। মনে রাখবেন, আমরা চাই অখণ্ড অটুট আস্ত এই মাছ।

ততদিনে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তার ডামাডোলে সব চাপা পড়ে গেল।

এত কাণ্ড হত না, যদি বরাতজোরে ল্যাটিমেরিয়া মাছ পাওয়া না যেত।

ভূপৃষ্ঠের নানা স্তর আছে। যেটি যত নীচে, তার বয়স তত বেশি। এইরকম সব স্তরে পাওয়া যায় জীবদেহের পাথর-হওয়া কঙ্কালের ছাপ। তাকে বলে ফসিল বা জীবাশ্ম।

একদিন এইভাবেই পাওয়া গিয়েছিল সিলাকান্থ মাছের ফসিল। তারই সঙ্গে আশ্চর্য মিল জ্যান্ত ধরা ল্যাটিমেরিয়া মাছের আঁশ, ল্যাজা, চোয়াল, কান্‌কো আর শিরদাঁড়ার। অদ্ভুত ধরনের এদের পাখনা। অনেকটা হাত-পা বা নৌকোর বৈঠার মতন। এদের তাই বলা হয় কান্‌কো-পাখনাওয়ালা মাছ।

এদের নাকের ফুটোর বিশেষত্ব হল, ফুটোদুটো সোজা গলা অব্দি গেছে। ফলে, অন্য মাছ যেখানে নাক দিয়ে শুধু গন্ধ শুঁকতে পারে, সেখানে পট্‌কাদুটোকে ফুসফুসের মতো কাজে লাগিয়ে সিলাকান্থ মাছ নাক দিয়ে নিশ্বাসও নিতে পারে। এদের পাখনা আছে বলে জলে সাঁতার কাটতে পারে।

সিলাকান্থ মাছ

আবার সেই পাখনার সঙ্গে জোড়া যেন গোদা-গোদা পা।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল ?

সিলা বলতে ফুটো। সেটা দিয়ে জলের বাইরে নিশ্বাস নিতে পারে। কান্থ বলতে কাঁটাঅলা পাখনা। কিছুটা পায়ের মতন। দুটোকে মেলালে কী হয় ? ডাঙাতেও নিশ্বাস নিতে আর **চলতে-ফিরতে পারে। অর্থাৎ উভচর।**

পৃথিবীর আদিম যুগে প্রচুর পাওয়া যেত জলজ্যান্ত এই মাছ। তখন হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছিল জলাজমি। ছিল বিশাল বিশাল অরণ্য আর বড় বড় পাতাওয়ালা চিরসবুজ উদ্ভিদ। তখন ডাঙার বাসিন্দা বলতে একদল উভচর জীবজানোয়ার। তারা কিছুটা সময় জলে থাকত। আর ছিল পোকামাকড়।

এর পর ভূপৃষ্ঠ ফুলে উঠে আরও অনেক নতুন নতুন পাহাড় গজাল। পৃথিবীর জলহাওয়া বদলে আরও শুকনো, আরও ঠাণ্ডা হল। নদীনালা বিলদিঘি শুকিয়ে কত মাছ, যে ঝাড়েবংশে লোপ পেল, তার ঠিক নেই। আর ঐ পাখনাওয়ালা মাছগুলোর ছিল শক্ত জান। আবহাওয়ার অদলবদল সত্ত্বেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারা ঠিক টিকে থাকল।

পৃথিবীর আরও বদল হল। পাখনাওয়ালা মাছ ক্রমেই কমতে লাগল। তারপর একেবারে উধাও।

আর-কোনো ফসিল না পেয়ে পণ্ডিতেরা ধরেই নিয়েছিলেন, ছ-কোটি বছর আগে লোপ পেয়েছে ঐ পাখনাওয়ালা মাছ। সিলাকান্থ।

এমন সময় অবাক কাণ্ড। জালে ধরা পড়ল জ্যান্ত ল্যাটিমেরিয়া মাছ!

এদিকে অধ্যাপক স্মিথের সে বিজ্ঞাপনের কী হল ?

সবুরে মেওয়া ফলেছিল।

প্রথম সিলাকান্থ পাওয়ার চোদ্দ বছর পর ভারত মহাসাগরে ফরাসি অধিকৃত এলাকায় পরের পর তিন বছরে ধরা পড়ল আরও চারটি সিলাকান্থ। ফলে, ষোলো বছরের মধ্যে মিলে গেছে তিরিশ কোটি বছর আগেকার মাছের সেই মোট পাঁচটি জলজ্যান্ত উত্তরপুরুষ। (ক্রমশ)

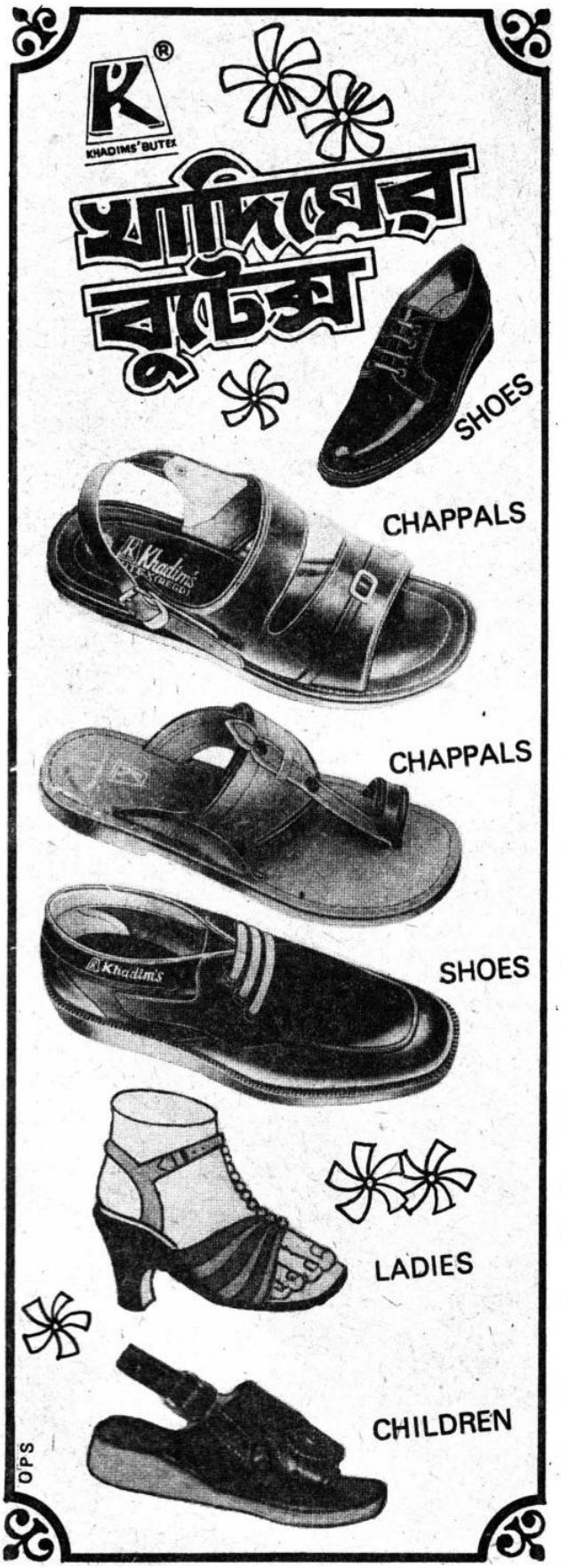

জেনে নাও

চুল কাটালে লাগে না কেন

চুল কাটালে তো লাগে না, কিন্তু শাস্তি দেবার জন্যে মাস্টারমশায় চুল ধরে টানলে ব্যথা লাগে কেন ? চুল টানলে ব্যথা লাগার কারণটা কী ?

ব্যথা লাগলে কী হয় ?

দেহের যেখানে ব্যথা লাগে সেখানকার স্নায়ুকোষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সে উদ্দীপনা স্নায়ুকোষের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে গেলেই আমরা ব্যথা-বেদনা বুঝতে পারি।

চুলের গোড়ায় স্নায়ুকোষ আছে। সেইজন্যে চুল টানলে কষ্ট হয়। কিন্তু চুলের গোড়া ছাড়া চুলের আর কোথাও স্নায়ুকোষ নেই বলে চুল কাটাবার সময়ে লাগে না।

আমরা ডান হাতে লিখি কেন

কেউ-কেউ যে বাঁ হাতে কলম ধরে না, তা নয়, কিন্তু আমরা বেশির ভাগ লোকেই ডান হাতে লেখালেখির কাজ করি। কেন ? আমাদের ডান হাতে লেখার কারণটা কী ?

আমাদের মস্তিষ্ক দুটো অংশে ভাগ করা। এই দুটো অংশই আকৃতিগতভাবে সমান। কিন্তু দেখা যায়, একটা দিক আর-একটা দিকের তুলনায় বেশি কাজের। মস্তিষ্কের বাঁ আর ডান দিকের মধ্যে বাঁ-দিকটাই বেশি কর্মক্ষম। মস্তিষ্কের যে দুটো অংশ,তার এক-একটা অংশ দায়িত্ব নেয় শরীরের এক-একটা দিকের। বাঁ-দিকের ওপরে শরীরের ডান দিকের দায়িত্ব আর ডান দিকটা ভার নিয়েছে শরীরের বাঁ দিকের।

আমাদের মস্তিষ্কের বাঁ-দিকটা ডান দিকের তুলনায় বেশি কাজের বলে আমাদের ডান হাতই চলে ভাল। বাঁ হাত নয়। লিখিও তাই ডান হাতে।

কিন্তু কেউ-কেউ যে বাঁ হাতে লেখে তার কারণটা কী ?

তাদের বেলায় মস্তিষ্কের ডান দিকটাই বেশি কাজের। কিন্তু কেন যে এমন হয়, সে-কথা আজও জানা যায়নি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

অর্থ জানো

ফার্সি দুশমন …

আগের দিনে হা-রে-রে-রে ডাক ছেড়ে ডাকাত পড়ত। ওই ডাকের জন্যই তারা ডাকাত। তখন দড়ির ফাঁস দিয়ে পথিককে হত্যা করত ফাঁসুড়েরা, ঠেঙাড়েরা ঠেঙা বা লাঠি মেরে খুন করত। নীচের শব্দগুলিতে ওদেরই কথা। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তর মেলাবে।

১। **ফেরেববাজ**—(ক) খুব চালাক, (খ) ডাহা মিথ্যাবাদী, (গ) ফেরারি বদমাস, (ঘ) জোচ্চোর।

২। **দুশমন**—(ক) আততায়ী, (খ) খুনে, (গ) শত্রু, (ঘ) হত্যাকারী গুণ্ডা।

৩। **রাহাজানি**—(ক) হঠাৎ এসে লুঠ করে পালিয়ে যাওয়া, (খ) পথে ডাকাতি, যার পরিণতি খুন-জখম, (গ) দলবদ্ধ হয়ে ছিনিয়ে নেওয়া, (ঘ) বড় রকমের ডাকাতি।

৪। **ছিচকে চোর**—(ক) যে চোর দিন-দুপুরে চুরি করে, (খ) অল্পবয়সী চোর, (গ) যে চোর লোহার সরু শিক চুরি করে, (ঘ) যে চোর সিঁদ না কেটে চুরি করে।

উত্তর—১। জোচ্চোর। মূলে ফার্সি ফরেব শব্দ, যার অর্থ জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা। ফার্সি বাজ শব্দের একটি অর্থ দক্ষ। যেমন—ফেরেববাজ, মামলাবাজ।

২। (গ) শত্রু। এ শব্দটিও আসলে ফার্সি। যেমন—'কহিল, জনাব, রক্ষা করুন দুশমন পাছে ধায়' (কবি কালিদাস রায়)।

৩। (খ) পথে ডাকাতি, যার পরিণতি খুন-জখম। মূলে ফার্সি রাহ্ শব্দ, যার অর্থ পথ, আর ফার্সি শব্দ জানির এক অর্থ হল খুনি। যেমন, জানি দুশমন।

৪। (ঘ) যে চোর লোহার সরু শিক চুরি করে। ঐ কাঠির মতো শিকের নাম ছিচকা বা ছিচকে, তা দিয়ে হুঁকোর নল সাফ করা হয়। এর অর্থ হল : ছিচকের মতো সামান্য তুচ্ছ বস্তুও চুরি করে যে চোর।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

আলিপুরের বাগানে

প্রত্যেক বছর শীতকালে আলিপুরের অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগানে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়। চামেলিদের সেখানে যাওয়া চাই-ই চাই। যত দেখে, মিলির চোখ তত বড়-বড় হয়ে যায়।

"Look, Mummy !" She'd cry every now and then, "Aren't those flowers gorgeous ! Look at those chrysanthemums, Daddy ! They must be the biggest and most beautiful in the whole world."

There's a very rich collection of chrysanthemums and dahlias every year. The banks of pansies are quite breath-taking in their beauty. The geraniums are a riot of colours.

"Why can't we grow roses like that in our garden, Mummy ?" Chambal would ask.

Mother would say, "It can't be easy to grow roses of that size. Somebody must have taken a great deal of trouble over them."

Then there are the cactii and other succulents.

Chambal said, "There can't be fewer than a hundred varieties here."

There were many varieties Chambal had never seen before. One was shaped like a snake.

But the most amazing exhibits were the bonsai, trees and plants artificially dwarfed by a method invented by the Japanese.

"Can that be a banyan tree ?" Mrs. Roy asked, pointing at a tree in a pot, not more than eighteen inches in height.

"Yes," said Mr. Roy, "and a fully mature one. Look at the fruits."

"How long does it take to grow a tree like that ?" asked Mr. Roy.

"It must take years," replied Mr. Roy. "But first you must learn the method."

Suddenly they discovered that Milly was not with them.

"Where can she be ?" They thought, and looked about them.

They had a few anxious moments.

Chambal tried to appear not to be worried.

"She must be about," he said, "and will be with us as soon as we get something to eat from that shop over there."

But Milly really had got lost though she couldn't have been far away.

When she was found at last she was almost in tears.

এবারে এই শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ করো :

CAN COULD MUST

It can't be easy to grow roses of that size.
There can't be fewer than a hundred varieties.
Can that be a banyan tree ?
She couldn't have been far away.
They must be the biggest in the world.
Somebody must have taken a great deal of care.
She must be about.

প্রসাদ

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট করেছে আয়োজন, শীতে উষ্ণ-মধুরতায় ভরাবে সবার শরীর-মন

চকোলেট সিজ্‌ল !

এক কাপ ফুটন্ত গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মেশান আর সবাইকে খাওয়ান—ধোঁয়া ওঠা চকোলেট সিজল কনকনে শীতে, শরীরকে চাঙ্গা রাখার এক মধুর উপায় !

চকোলেট সুঅর্ল !

বেশ খানিকটা গরম দুধে তিন চা-চামচা ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন—ওপর থেকে দিন মধু ছড়িয়ে ! এ এক মধুর চকোলেট সুঅর্ল শীতের দিনের সাদর-আহ্বান, ভরিয়ে তোলে উষ্ণতায় দেহ-মন-প্রাণ।

চকোলেট নাটি !

গরম ধোঁয়া ওঠা এক কাপ দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন। কুচো-বাদাম ছড়িয়ে দিন ওপরে ! চমৎকার চকোলেট নার্টি ! উষ্ণ-মধুর চকোলেট মজাদার—ঘরের পানে টানে বারবার !

চকোলেট স্পাইস !

একমগ গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট দিন মিশিয়ে ! দারুচিনি, জায়ফল ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে দিন—এ এক তাক্ লাগানো চকোলেট স্পাইস ! শীতের দিনে দেহ-মনে এনে দেয় উষ্ণতার অনুরণন !

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট ২০০ গ্রামের টিনেও পাওয়া যায় !

OBM/3323 BEN

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

গোলমাল

সকালবেলাটি বড় মনোরম। বড় সুন্দর। দোতলার ঘর থেকে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে হরিবাবুর মনটা খুব ভাল হয়ে গেল। বাগানে হাজাররকম গাছগাছালি। পাখিরা ডাকাডাকি করছে, শরৎকালের মোলায়েম সকালের ঠাণ্ডা রোদে চারদিক ভারী ফটফটে। উঠোনে রামরতন কাঠ কাটছে। বুড়ি ঝি বুধিয়া পশ্চিমের দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। টমি কুকুর একটা ফড়িঙের পিছনে ছোটাছুটি করছে। লকড়িঘরের চালে গম্ভীরভাবে বসে আছে বেড়াল ঝুমঝুমি। নীচের তলায় পড়ার ঘর থেকে হরিবাবুর ছেলে আর মেয়ের তারস্বরে পড়ার শব্দ আসছে। আর আসছে রান্নাঘর থেকে লুচি ভাজার গন্ধ। তিনি শুনেছেন, আজ সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে ফুলকপির চচ্চড়িও থাকবে। হরিবাবু দাড়ি কামিয়েছেন, চা খেয়েছেন, লুচি খেয়ে বেড়াতে বেরোবেন। আজ ছুটির দিন।

ক'দিন ধরে হরিবাবুর মন ভাল নেই। তিনি ভাল রোজগার করেন। তাঁর কোনো রোগ নেই। সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব। কিন্তু তাঁর একটি গোপন শখ আছে। বাইরে তিনি যাই হোন, ভিতরে ভিতরে তিনি একজন কবি। তবে তাঁর কবিতা কোথাও ছাপা হয়নি তেমন। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে তিনি রোজ অনবরত লিখে চলেছেন কবিতার পর কবিতা। এযাবৎ গোটা কুড়ি মোটামোটা খাতা ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু গত প্রায় পাঁচ-সাতদিন বিস্তর ধস্তাধস্তি করেও এক লাইন কবিতাও তিনি লিখতে পারেননি। তাই মনটা বড় খারাপ।

আজ সকালের মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে কবিতার খাতা খুলে বসলেন। মনটা বেশ ফুরফুর করছে। বুকের ভিতরে কবিতার ভুরভুরি উঠছে। হাতটা নিশপিশ করছে। তিনি স্পষ্ট টের পাচ্ছেন, কবিতা আসছে। আসছে। তবে আর একটা কী যেন বাকি। আর একটা শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা দৃশ্য যোগ হলেই ভিতরে কবিতার ডিমটা ফেটে শিশু-কবিতা বেরিয়ে আসবে ডাক ছাড়তে ছাড়তে।

হরিবাবু উঠলেন। একটু অস্থিরভাবে অধীর পায়ে পায়চারি করতে লাগলেন দোতলার বারান্দায়। একটা টিয়া ডাক ছেড়ে আমগাছ থেকে উড়ে গেল। নীচের তলায় কোণের ঘর থেকে হরিবাবুর ভাই পরিবাবুর গলা সাধার তীব্র আওয়াজ আসছে। কিন্তু না, এসব নয়। আরও একটা যেন কিছুর দরকার। কী সেটা ?

হরিবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। একটা ট্রেন যাচ্ছে। ঝিকির-ঝিকির ঝিকির-ঝিকির মিষ্টি শব্দে মাটি কাঁপিয়ে, বাতাসে ঢেউ তুলে গাছপালার আড়াল দিয়ে আপনমনে আপ ট্রেন চলে যাচ্ছে গন্তব্যে। বাঃ, চমৎকার। এই তো চাই। কবিতার ডিম ফেটে গেছে।

হরিবাবু দৌড়ে এসে টেবিলে বসে খাতা-কলম টেনে নিলেন। তারপর লিখলেন :

দ্যাখো ওই ভোরের প্রতিভা
ম্লান বিধবার মতো কুড়াতেছে শিউলির ফুল,
সূর্যের রক্তাক্ত বুকে দীর্ঘ ছুরিকার মতো ঢুকে যায় ট্রেন।

বান্টু নামে বাচ্চা চাকর এসে ডাকল, "বাবু, লুচি খাবেন যে ! আসুন।"

হরিবাবু খুনির চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে বললেন, "এখন ডিস্টার্ব করলে লাশ ফেলে দেব ! যাঃ।"

ছেলেটা হরিবাবুকে ভালই চেনে। হরিবাবু যে ভাল লোক তাতে সন্দেহ নেই, তবে কবিতা লেখার সময় লোকটা সাক্ষাৎ খুনে।

সুতরাং বান্টু মিনমিন করে 'লুচি যে ঠাণ্ডা মেরে গেল' বলেই পালাল।

কিন্তু হরিবাবুর চিন্তার সূত্র সেই যে ছিন্ন হল, আর আধঘণ্টার মধ্যে জোড়া লাগল না। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটা আর কিছুতেই মাথায় আসছে না। বহুবার উঠলেন, জল খেলেন, মাথা ঝাঁকালেন, একটু ব্যায়ামও করে নিলেন। কিন্তু নাঃ, এল না।

পরিবাবুর গান থামল। ছেলেমেয়ের পড়া থামল। পাখির ডাক থামল। কাঠ কাটার শব্দও আর হচ্ছে না। রোদ বেশ চড়ে গেল। হরিবাবুর পেট চুঁইচুঁই করতে লাগল। তবু এল না।

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খাতাটা বন্ধ করলেন। তারপর নীরবে খাওয়ার ঘরে এসে টেবিলে বসলেন।

তাঁর স্ত্রী সুনয়নী দেবী ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "এত বেলায় আর জলখাবার খেয়ে কী হবে ? যাও, চান করে এসে একেবারে ভাত খেতে বোসো। বেলা বারোটা বাজে।"

"বারোটা ?" খুব অবাক হলেন হরিবাবু। দেয়ালঘড়িতে দেখলেন সত্যিই বারোটা বাজে। এক গ্লাস জল খেয়ে হরিবাবু উঠে পড়লেন। তারপর পিছনের বাগানে এসে গাছপালার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

কিন্তু কোথাও শান্তি বা নির্জনতা নেই। বাগানের কোণের দিকে মাটি কুপিয়ে তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই ন্যাড়া একটা কুস্তির আখড়া বানিয়েছে। সেইখানে তিন-চারজন এখন মহড়া নিচ্ছে। হুপহাপ গুপগাপ শব্দ। বিরক্ত হয়ে হরিবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বেরোবার মুখেই দেখলেন বাড়ির সামনে একটা উটকো লোক দাঁড়িয়ে আছে। গালে কয়েকদিনের রুখু দাড়ি, পরনে একটা ময়লা পাজামা, গায়ে তাপ্পি দেওয়া একটা ঢোলা জামা, কাঁধে একটা বেশ বড় পোঁটলা। রোগাভোগা কাহিল চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়, ত্রিশের কাছাকাছি।

লোকটাকে দেখেই হরিবাবুর মনে পড়ল, ইদানীং খুব চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত হয়েছে শহরে। এই লোকটার চেহারাটাও সন্দেহজনক। উঁকিঝুঁকিও মারছে। সুতরাং তিনি লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে ধমকের স্বরে বললেন, "এই, তুমি কে হে ? কেয়া মাংতা ? হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট ?"

তিন-তিনটে ভাষায় ধমক খেয়ে লোকটা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ে মিনমিন করে বলল, "আমি অনেক দূর থেকে আসছি।"

হরিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "তাহলে মাথা কিনে নিয়েছ আর কী। দূর থেকে আসছ তো কী ? আসতে বলেছিল কে ? না এলেই বা এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হত ?"

লোকটা এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "তা বটে, না এলেও হত।"

"তাহলে এবার কেটে পড়ো। যত দূর থেকে এসেছ, আবার তত দূরেই ফিরে যাও। নইলে পুলিশ ডাকব।"

লোকটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে বুঝেছে। কিছুক্ষণ ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা খুব ভয়ে-ভয়ে বলল, "আজ্ঞে একটা কথা ছিল। সেটা জেনেই চলে যাব।"

"কী কথা ? অ্যাঁ ! তোমার মতো ভ্যাগাবণ্ডের আবার কথা কিসের ? যত সব গাঁজাখুরি দুঃখের কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলবে, আর বাড়ির দিকে আড়ে-আড়ে চেয়ে কোথায় কী আছে নজর করবে তো ? ওসব কায়দা আমি ঢের জানি।"

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে কথাটা ঠিকই বলেছেন। দিনকাল ভাল নয়। চারদিকে চোর-জোচ্চোর সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। উটকো লোককে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। তবে আমার কথাটা খুবই ছোট। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম এটাই শিবু হালদার মশাইয়ের বাড়ি কি না।"

"হলে কী করবে ?"

"তাঁর বড় ছেলেকে একটা কথা বলে যাব আর একটা জিনিসও দিয়ে যাব।"

"কী কথা ? কী জিনিস ?"

"আজ্ঞে সে তো শিবু হালদার মশাইয়ের বড় ছেলে ছাড়া আর-কাউকে বলা যাবে না।"

হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমিই শিবু হালদারের বড় ছেলে, আর এটাই শিবু হালদারের বাড়ি।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আমিও এরকমই অনুমান করেছিলাম।"

হরিবাবু বললেন, "আর তোমার হনুমানে কাজ নেই। শিবু হালদারের বাড়ি এ-শহরের সবাই চেনে। বেশি বোকা সেজো

না। যা বলবার বলে ফেলো।"

লোকটা ভারী কাচুমাচু হয়ে বলে, "আজ্ঞে আমি একরকম তাঁর কাছ থেকেই আসছি।"

"একরকম! একরকম মানেটা কী হল হে? তাঁর কাছ থেকে আসছ মানেটাই বা কী? ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পেলে না?"

লোকটা সবেগে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আপনি বড় ভড়কে দেন মানুষকে। অত ধমকালে কি বুদ্ধি ঠিক থাকে?"

"বুদ্ধি অনেক খেলিয়েছ, এবার পেটের কথাটি মুখে আনো তো বাছাধন। শিবু হালদারকে তুমি পেলে কোথায়? তিনি তো বছর বিশেক আগেই গত হয়েছেন।"

"আজ্ঞে তা হবে। তিনি যে আর ইহধামে নেই সে-কথা খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। স্বনামধন্য লোক ছিলেন। বাঙালির মধ্যে অমন প্রতিভা খুব কম দেখা যায়।"

"তা কথাটা কী তা বলবে?"

"বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা প্রায় ত্রিশ বছর আগে। আপনি তখন এইটুকু।"

"বটে! তা তুমি তখন কতটুকু?"

"আমাকে দেখে বয়সের অনুমান পাবেন না।"

"তাই নাকি ব্যাটা হনুমান? ডাকব ন্যাড়াকে?"

"থাক থাক, লোক ডাকতে হবে না। আপনি একাই একশো। শিবু হালদার মশাই বলতেন বটে, ওরে পীতাম্বর, তুই দেখে নিস, আমার বড় ছেলে এই হরি একদিন কবি হবে। ওর হাত পা চোখ সব কবির মতো, তা দেখছি, শিবু হালদারের মতো বিচক্ষণ লোকেরও ভুল হয়। কবি কোথায়, এ তো দেখছি দারোগা।"

এ-কথায় হরিবাবুর এবার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার পালা। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাবা বলতেন ও-কথা?"

"তবে কি বানিয়ে বলছি?"

হরিবাবু ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি বাপু বড্ড ঘড়েল দেখছি। শিবু হালদারকে চিনতে, তার মানে তোমার বয়স তখন..."

লোকটা শশব্যস্তে বলল, "বেশি নয়, চল্লিশের মধ্যেই। এখন এই সত্তর চলছে।"

"সত্তর?"

"সামনের মাঘে একাত্তর পূর্ণ হবে।"

"মিথ্যে কথা!"

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কেউ বিশ্বাস করে না। তা সে যাকগে। গত ত্রিশ বছর তাঁর একটা দায় কাঁধে নিয়ে ঘুরছি। সেই দায় থেকে মুক্ত হতেই আসা।"

বলে লোকটা পাজামার কোমর থেকে একটা গোঁজে বার করে আনল। তারপর সেটা হরিবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।"

হরিবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আর জানি না। শিবু হালদার মশাই এর বেশি আর বলেননি।" (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

মন-ভাল-করা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?
হ্রস্ব দীর্ঘ নীল-নীলান্ত
কেন ওর রং খর ও শান্ত,
লাল হরিদ্রা সবুজাভ বন ?
মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?
মাছরাঙাটির গায়ে আলো পড়ে,
হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে,
মাছরাঙাটির গায়ে হাওয়া পড়ে।
মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?

সময় থাকতে যত্ন নাও টাকা জমাও দেশ বাঁচাও

টাইমেক্স

ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড

(১৯৫৬ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানি অ্যাক্ট অনুযায়ী নথিবদ্ধ একটি নন ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান) ।

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫২, শ্যামবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪

ধানবাদ প্রধান শাখা : কাটরাস রোড, ব্যাংক মোর, ধানবাদ ।

বাবুইবাবু

শ্যামলকান্তি দাশ

মা বললেন, "পরীক্ষা শেষ,
বাবুই এখন খেলুক লুডো,"
বাবা বললেন, "আরে রামো,
বাবুই শিখবে কংফু, জুডো ।"

ঠাম্মা বলেন, "বাবুইভায়া,
দিচ্ছি তোকে পাখির ডানা,
তেঁতুলগাছের টঙ থেকে ভাই
আন্ তো পেড়ে হনুর ছানা ।"

পিসি বলল, "কই রে লাটাই,
বাবুই ছাদে, আয় রে ঘুড়ি,"
দাদু বললেন, "বাবুইবাবু
জ্ঞানসমুদ্রে কুড়োক নুড়ি ।"

কাকু বলল, "বিচ্ছু ছেলে,
চল্ তো এখন অঙ্ক শিখি,"
অমনি বাবুই চিল-চ্যাঁচাল,
"গুলতি ছুঁড়ব, পালাও দিকি ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

কী ছিল রাধামাধববাবুর ক্যাশবাক্সের ডালার তলায় ?

রাধামাধবের সম্পত্তি

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

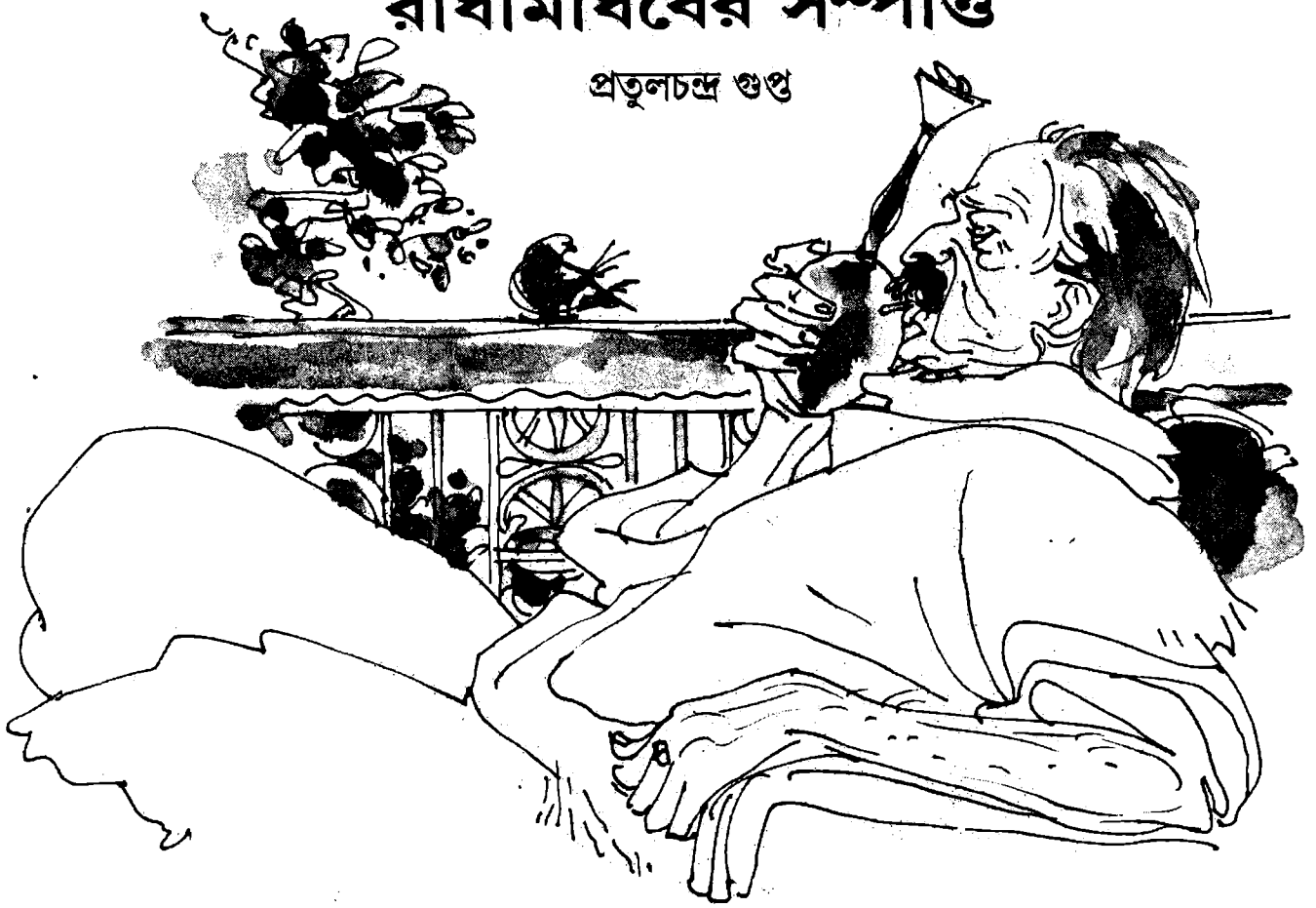

রতনদের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হল বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। সিঁড়ির মোড় থেকে ফিরে আসব ভাবছি, এমন সময় দোতলার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে মনাই আমাকে দেখতে পেল। বলল, "কে ওখানে ? জেঠু নাকি ?"

ঘরে ঢুকে দেখি মনাই বিছানায় শুয়ে আছে। বালিশের তলায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গল্পের বই। বিছানার একপাশে নতুন আনন্দমেলা দুমড়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, "এত বেলায় শুয়ে আছিস কেন ?"

মনাই বলল, "জানো না তুমি, চারদিন আগে আমার যে খুব অসুখ করেছিল।"

বললাম, "কেন, ফুচকা আর আলুকাবলি ইস্কুলে বেশি করে খেয়েছিলিস বুঝি ?"

মনাই বলল, "না, তা নয়। বাবা কোথা থেকে কচুরি আর কাবাব নিয়ে এসেছিল, তাই একটু চেখে দেখেছিলাম। আর কারুর কিন্তু কিছু হয়নি।"

আমি বললাম, "বাড়ির আর সবাই গেল কোথায় ?"

মনাই বলল, "বাবা-মা লেকটাউন গিয়েছে, খেয়ে-দেয়ে ফিরতে বিকেল হবে। আর ঠাকুমা তো উপরে পুজোর ঘরে, নামতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি।"

আমি বললাম, "তুই দুপুরে কী খাবি ?"

মনাই মুখ ব্যাজার করে বলল, "বলেছে তো যদি ভাল হয়ে থাকি, আজ একটু নরম ভাত আর শিঙ্গিমাছের ঝোল দেবে ? তা তুমিই বলো, সেসব কি খাওয়া যায় ? তার চেয়ে আমাকে একটা গল্প শোনাও, মন ভাল থাকবে। কিন্তু সত্যি গল্প হওয়া চাই।"

আমি বললাম, "গল্প কি কখনও সত্যি হয়।"

"তা হোক, তুমি তো কত জায়গায় গিয়েছ, একটা ভাল দেখে গল্প বলো যাতে সত্যি বলে মনে হয়।"

আমি বললাম, "তবে শোন্। অনেকদিন আগেকার কথা—"

মনাই বলল, "ও গল্প নয়, তুমি তো রাজা-রানি আর সন্ন্যাসীর গল্প বলবে, না-না, অত পুরনো নয়।"

বললাম, "আমি কি আর সে-রকম সন্ন্যাসী দেখেছি। আর রাজা-রানি তো কেবল ছবিতে। এই ধর আমি যখন তোর মতন ছোট ছিলাম তখনকার কথা।"

মনাই বলল, "তা হলে বলো। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কথা শুনব না, আমি অনেক শুনেছি।"

আমি বললাম, "না-না, পাড়াগাঁ নয়, আমার যখন তোর মতন বয়স তখন একটি ছোট্ট শহরে থাকতাম। তাই বলে খুব ছোট শহর নয়, সেখানে একটা রাস্তায় ফুটপাথ ছিল। গোটাতিনেক ইস্কুল ছিল, একটায় আমি পড়তাম। ইস্কুল

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু…

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত …বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন…

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTÁS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

থেকে বাড়ি ফিরবার সময় বাড়ির খুব কাছে প্রায় উল্টো দিকে দেখতাম রাধামাধব সান্যাল বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। বুড়োমানুষ, রোগা, মাথার সামনের দিকটায় টাক। সব সময় মুখ গম্ভীর কিংবা বিরক্ত মুখ। এক সময় জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। বেশ কিছু টাকা জমানো আছে, কোথায় আছে কেউ জানে না। একেবারে একা থাকতেন না ; ছোট ভাই গৌরমাধব তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁর চল্লিশের উপরে বয়েস। দাদার মতো গম্ভীর নন। বাড়ি থেকে মাইল-দুয়েক দূরে একটা ইস্কুলে চাকরি করতে যান। তিনি সকাল সকাল ভাত খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। ইস্কুলের পর এখানে-ওখানে ঘুরে রাত্রে ঘরে ফিরতেন। দাদা খুব রাশভারী, তাঁকে ভয় করে চলতেন। পারতপক্ষে সামনে আসতে চাইতেন না।" মনাই বলল, "রান্নাবান্না কে করত ?"

আমি বললাম, "রান্নাবান্না কে করবে ? এদের এক ভাগ্নি ছিলেন কেষ্টদাসী, বিধবা— তিনকুলে কেউ নেই। তিনি মামাদের ঘর-সংসার দেখতেন ; বাড়িতে একটা গোরু ছিল, তারও সেবা করতেন। পরনের শাড়ি-শেমিজ আধ-ময়লা, বাড়িতে কাচা। মামা ধোপার খরচ বাড়ুক পছন্দ করতেন না। কেষ্টদাসীর ডানহাতে উল্কি করে লেখা 'জয়গুরু'। বড়মামাকে একটু ভয় করে চলতেন, বাড়িতে থাকলে তাঁর গলার স্বর শোনা যেত না। দুপুরে মামা ঘুমোলে পাড়ায় বেড়াতে যেতেন, তখন বেশ চড়া গলা শোনা যেত। প্রায় মামার মতো রাগী মেজাজ, কিন্তু সব সময় বোঝা যেত না। বড়মামাকে খুব ভয় করতেন কিন্তু ছোটমামাকে দেখতে পারতেন না। ইস্কুলের ভাত একটু তাড়াতাড়ি দিতে হত। কেষ্টদাসী কোনোরকমে ভাত, ডাল, বেগুনসিদ্ধ, আলুভাজা আর একটা যাহোক করে রান্না করে ছোটমামা খেতে বসলে থালাটা দমাস করে তাঁর সামনে দিয়ে দিতেন। বড়মামার কথা আলাদা। তিনি দুপুর বারোটার আগে খেতে বসতেন না। তাঁর খাবার সময় হলে মেঝের উপর জলছড়া দিতেন, আসন পাততেন, যত্ন করে খাবার গুছিয়ে দিতেন, ভাত চুড়োর মতো বেড়ে তাতে একটু ঘি দিতেন। বড়িভাজা, বেসন দিয়ে বেগুনভাজা, আলুর দম ; খাওয়ার শেষে অম্বল, কখনও কখনও বাড়ির তৈরি দুটি সন্দেশ। নিন্দুকরা বলত, যদি বড়মামা বাড়িটা লিখে দিয়ে যান—তার জন্য এত সব।

"রাধামাধববাবু তো বাড়ি থেকে পারতপক্ষে কোথাও বেরোতেন না। বাড়িতে কয়েকটা পাতাবাহারগাছ, দুটো শিউলিগাছ, তাতে পুজোর সময় খুব ফুল ফুটত আর শুঁয়োপোকা হত। তাছাড়া ভিতরের দিকে দুটো কুলগাছ, টক কুল। বাড়ির পেছন দিকে একটা কামরাঙা আর একটা চালতাগাছ ছিল। পাড়ার ছেলেরা রাধামাধববাবুকে এত ভয় পেত যে, বাড়িতে ঢুকতে কারও সাহস হত না। সরস্বতীপুজোর সময় ইস্কুল সাজাবার জন্য পাতাবাহার নিয়ে যায় এমন সাহস কারুর ছিল না। কুলগাছ থেকে কুল মাটিতে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খাবার লোক ছিল না। গোয়াল ঘরের পিছনে আমগাছ, কিন্তু সে-গাছেও বাইরের লোকের হাত পড়ত না।

"ভাদ্রমাসের শেষ। আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। শেষ রাত্রে একটু ঠাণ্ডা পড়ে, গায়ে চাদর দিতে হয়। বাতাসে পুজো-পুজো ভাব। সকাল সাড়ে দশটার সময় রাধামাধববাবু সামনের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন আর একটু বেলা হলে স্নান করতে যাবেন। এমন সময় পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল। এ-বাড়িতে চিঠি বিশেষ আসে না। কেবল বিজয়ায় দু-একজন আত্মীয় দূর থেকে চিঠি লেখেন। অনেক দিন আগে রাধামাধববাবু একবার নবদ্বীপ গিয়েছিলেন। সেখানকার পাণ্ডাঠাকুর বছরে একবার চিঠি লেখেন কিন্তু রাধামাধববাবু তাঁকে এক পয়সাও পাঠান না ; তিনি যে খুব কিপটে সে-কথা পাড়ার সবাই জানে। তাঁর টাকাপয়সা কত আছে তা নিয়ে পাড়ায় আলোচনা হয়। সে-টাকা তিনি কোথায় রাখেন তা নিয়েও জল্পনা হয়। ভাই বেশি পাবে, না ভাগ্নি বেশি পাবে এসবও আলোচনার বিষয়। রাধামাধববাবু যে ঘরে থাকেন সে ঘর বেশি বড় নয়। আসবাবও বেশি নেই। একটা ছোট্ট খাট, তার উপরে ময়লা মশারি, কাপড় রাখবার আলনা। একটা ছোট টেবিল, তার পাশে টিনের চেয়ার। দুটো টুল। মাথার উপরে কাঠের পাটাতন, ছাদ থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো। তার উপর বাড়ির সবার লেপ-কম্বল, কাঁথা, বাড়তি বালিশ, তোশক। পুজোর পরে শীত পড়ে যাবে, তখন নামানো হবে। ছোট টেবিলের উপরে পুরনো ধরনের ক্যাশবাক্স। উপরের ডালায় খোপকাটা ; কিন্তু ডালার ভিতরে কী আছে তা কেউ জানে না। তিনি যখন বাক্স খোলেন তখন ঘর থেকে সবাইকে ভাগিয়ে দেন। পাড়ার লোকেরা বলে, ডালার নীচেটা হাজার টাকার নোটে ভর্তি।

"পিওনের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে রাধামাধববাবু পকেট থেকে চশমা বার করলেন। প্রথমবার দেখে নিয়ে চিঠিটা আর একবার পড়লেন। আগে যে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন সেখান থেকে চিঠি। বছর-পাঁচেক আগে জমিদারবাবু গত হয়েছেন। জমিদার-গিন্নি তাঁর নায়েবকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন। তাঁর মানত ছিল একশোজন ব্রাহ্মণ খাওয়াবেন। দশদিন পরে সেই কাজ। রাধামাধববাবু পুরনো লোক, ব্রাহ্মণ তো বটেই। এলে দেখাশোনাও করতে পারবেন। চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তিনি তো বাড়ি থেকেই বেরোন না। পুরনো মালিকের বাড়ি থেকে চিঠি, না বলা যায় না। একটু অপ্রসন্ন মনে যাওয়া স্থির করলেন। ভাবলেন, যাতায়াতের খরচ ওঁরা নিশ্চয় দেবেন। যাবার দিন বাক্সটা সিন্দুকের মধ্যে পুরলেন। ঘরের দরজায় তালা লাগালেন। ভাই ও ভাগ্নিকে বললেন 'সাবধানে থাকবি।'

"জায়গাটার নাম তুলসীঘাট। গাইবান্ধা স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে যেতে হয়। রাস্তার অবস্থা ভাল, কষ্ট হল না ; রাধামাধববাবু বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে গেলেন। জমিদার-গিন্নিকে প্রণাম করলেন, সন্ধ্যার পর লণ্ঠন জ্বালিয়ে হিসেব করতে বসলেন। কী কী রান্না হবে, কতজন লোক খাবে, গ্রামের লোক তো সবাইকে বলা হয়েছে। বেশ কিছু আত্মীয়স্বজনও বাইরে থেকে এসেছেন। বিদায়-দক্ষিণার খরচের হিসাবও করলেন। এইসব নিয়ে পাঁচ দিন বেশ কেটে গেল। রাধামাধববাবুর খারাপ লাগল না। তাঁর নিজের বাড়িতে তো পানাপুকুরের মতো নিস্তরঙ্গ জীবন। অবশেষে যাবার দিন এসে গেল। জমিদার-গিন্নি চোখে কাপড় দিয়ে পুরনো দিনের কথা মনে করে একটু কাঁদলেন। রাধামাধববাবু দূর থেকে প্রণাম

করে গাড়িতে উঠলেন। অর্ধেকটা রাস্তা আসতে আসতে তাঁর মনে হল শরীরটা তেমন জুত লাগছে না। একে তো সকাল-সকাল স্নান করতে হয়েছে, যা তাঁর অভ্যেস নেই। তার উপরে দিনচারেক নাম-সংকীর্তন। দু'বেলাই পায়েস খেয়েছেন। ভোগের পায়েসকে ওঁরা বলেন পরমান্ন। এত খাওয়াও তাঁর অভ্যেস নেই। প্রথমে ভাবলেন বুঝি পেট গরম হয়েছে। তারপর মনে হল শীত-শীত করছে। বাড়ি ফিরেই এক ডোজ রাসটক্স থার্টি খেয়ে নিলেন। সে রাত্রে আর খেতে ইচ্ছে হল না, জামাকাপড় বদলে শুয়ে পড়লেন। সকালে উঠে মনে হল শরীর আরও খারাপ। গা গরম, মাথায় খুব ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেষ্টদাসী এসে জিজ্ঞেস করল, 'মামা তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?' মামা বললেন, 'খুব নয়, তবে এ-বেলা ভাতটা আর খাব না, স্নানও করব না।' এক কাপ কড়া চা খেলেন, এক ছিলিম তামাক খাওয়ার চেষ্টা করলেন, ভাল লাগল না। বাড়ির তুলসীগাছ থেকে কয়েকটা পাতা তুলে মধু দিয়ে মেড়ে খেলেন। ছোট ভাই এসে বলল, 'দাদা, একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকি?' দাদা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোদের বড় খরচের অভ্যেস, ডাক্তার ডেকে কী হবে? একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, ও ঠিক হয়ে যাবে।' দুপুরের পর থেকে তেড়ে জ্বর এল। সেদিনও ডাক্তার ডাকা হল না, সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। পরদিন সকালে কেদারেশ্বরবাবু এলেন। তিনি সাইকেল থেকে নেমে পিছনে বাঁধা ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। রাধামাধববাবুর চোখটা তখন একটু ঘোলাটে হয়েছে, বিড়বিড় করে কী বলছেন বোঝা যাচ্ছে না। কেদারেশ্বরবাবু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না। বয়েস হয়েছে তো, একটু সাবধানে রাখতে হবে। একটা শিশি দিয়ে আমার ডিসপেন্সারিতে একটা লোক পাঠিয়ে দেবেন। আবার ও-বেলা এসে দেখে যাব। ও-বেলাও যদি জ্বর না কমে তাহলে অ্যাশসাহেবকে খবর দিতে হবে।' অ্যাশসাহেবকে ডাকা মানেই বেশি খরচ, বাড়ির লোক খুশি হল না। শেষ রাত থেকে রাধামাধববাবু খুব ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। সেই রাত্রেই পাড়ার দু-চারজন আসতে শুরু করলেন। কেষ্টদাসী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মামা, আমার কী উপায় করে গেলে?' মামার তখন কিছু বলবার শক্তি নেই। কী বুঝলেন জানি না। অনেক কষ্টে একটা আঙুল দিয়ে উপরের দিক দেখালেন। কী বলবার চেষ্টা করছেন বোঝা গেল না। কেষ্টদাসী চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

"কড়া মেজাজের জন্য রাধামাধববাবুকে কেউ বিশেষ পছন্দ করত না, কিন্তু শ্মশানে অনেক লোক গিয়েছিল। যাই হোক পাড়ার লোক, অনেক বয়স হয়েছিল। অনেকে বলল, আর যাই হোক রাজার মতন মেজাজ ছিল। যারা তাঁকে দেখতে পারত না তারাই শ্মশানে গিয়ে বলতে লাগল একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল। যে কথা সবার মনে ছিল সে কথা কিন্তু কেউ বলল না—বুড়ো কত টাকা রেখে গিয়েছে?

"সে কথা জানবার আগেই শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল। রাধামাধববাবু লুচি খেতে ভালবাসতেন। পূর্ণিমার রাত্রে নিয়ম করে লুচি খেতেন। যারা শ্মশানে গিয়েছিল তাদের লুচি খাওয়ানো হল। সব চুকে যাবার পর একদিন সিন্দুক খোলা হল। দুজন মিলে খুললেন, রাধামাধববাবুর ভাই আর ভাগ্নি, তাছাড়া পাড়ার দু-একজন মাতব্বরকেও ডেকে আনা হয়েছিল। ঘর কয়েকদিন বন্ধ ছিল। শ্মশানে যাবার পর তো আর খোলা হয়নি। ঘরে কীরকম ভ্যাপসা গন্ধ। পাটাতনে তোলা বালিশের মধ্যে একটা ছেঁড়া। ঘরে তুলো ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির মজুমদারমশায় বললেন, ঘরে কেউ থাকত না, ইঁদুর কী কাণ্ড করেছে? গৌরমাধববাবু বললেন, নর্দমা তো ইঁট দিয়ে বন্ধ, ইঁদুর এল কোথা থেকে? বলে কড়া চোখে কেষ্টদাসীর দিকে তাকালেন। কেষ্টদাসী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। বোধহয় শুনতে পেলেন না। সিন্দুক খুলে বাক্স বের করা হল। খোপের মধ্যে কয়েকটা সিকি, দোয়ানি আর তামার পয়সা। আর একটা খোপে ভিক্টোরিয়ার আমলের দুটো রুপোর টাকা। একটা খোপে দুটো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো আছে। মোড়কের উপরে লেখা বৃন্দাবনের পাণ্ডাঠাকুরের জন্য। পাঠানো হয়নি। পুরনো কাগজ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর একটিতে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত হাঁপানির ওষুধ। আর একটি পোস্টআপিসের পাশবই, তাতে চারশো একানব্বুই টাকা বারো আনা জমা আছে। মাতব্বরদের মধ্যে একজন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না! বললেন, 'ধ্যাত!' ডালার নীচে নোট-টোট কিছু নেই, কাগজপত্রে ঠাসা। অনেক বন্ধকি তমসুকের কাগজ সব তামাদি হয়ে গিয়েছে।

"আমরা যারা ছোট তারাও ঘরে এসেছিলাম। ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তিন-চারজন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাতব্বররা দু-একজন আমাদের ডেকে বলতে লাগলেন, তোরা তো এ-পাড়ার ছেলে, সাবধানে থাকবি। রাত্রে হঠাৎ কেউ ডাকলে চট করে বাইরে যাবি না। তিনবার না ডাকলে চুপ করে শুয়ে থাকবি। আমাকে একজন বললেন, তোদের বাড়িতে তো আবার একটা বেলগাছ আছে। রাত্রে যদি কখনও দেখিস বেলগাছ থেকে কেউ সাদা কাপড় পরে নামছে ভয় পাবি না। ওঁরা খুব ভাল লোক, কারুর অনিষ্ট করেন না।

"সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরতেই ঠাকুমা বললেন, 'আমি এক্ষুনি নীলফামারি যাচ্ছি, বোনপোর খুব অসুখ, তাদের ওখান থেকে লোক এসেছে। ফিরতে পাঁচ-ছ'দিন তো হবেই। তুই সাবধানে থাকবি, আমি হালখড়িয়াকে বলে গেলাম রাত্রে তোর ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শোবে। বাইরের ঘরে ধীরেন থাকবে। শীত পড়তে আরম্ভ করেছে, ঠাণ্ডা লাগিও না। সকালে নিয়ম করে অঙ্ক কষবে। সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা মনে রেখো।"

"রাত্রের গাড়িতে ঠাকুমা চলে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে একটা কাণ্ড ঘটল। ধীরেনদা তো খেয়ে-দেয়ে শুতে চলে গেল। আমি জিওগ্রাফি পড়ছিলাম, আমাকে বলল, দশটার সময় লণ্ঠন নিবিয়ে দিস। আমি পড়তে পড়তে লক্ষ করলাম হালখড়িয়াদা খেয়ে এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুয়ে নাক ডাকতে লাগল। আমিও কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত জানি না, কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক ডাক নয়, কুকুরের কান্না। কুকুরটার নাম ভুলুয়া, সাদা রং, নাকের উপর

কালো দাগ, সব বাড়িতে খেয়ে বেড়ায়, রাত্রে এসে শুয়ে থাকে। দেখতে বেশ মোটাসোটা, কিন্তু খুব ভিতু। একটা বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করার সময় বিড়ালটা নাকি ওর নাকে আঁচড়ে দিয়েছিল, তাইতে ওর সব সাহস চলে গিয়েছে। হালখড়িয়াদাকে ডাকলাম, কিন্তু সাড়া দিল না। এদিকে শুনতে পেলাম কুকুরটা ধড়ফড় করে পালিয়ে যাচ্ছে। জানালা একটু খুলে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। দেখলাম কে একজন রোগামতন, গায়ে সাদা কাপড়—আমার জানালার তলা দিয়ে পুবদিকে হত্তুকি গাছের তলা দিয়ে ভাঙা গোয়ালের পাশে ডোবার ধারে চলে গেল। তার আগে একটু কাঁঠালগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। কাঁঠাল গাছের শুকনো পাতা পায়ের চাপে মড়মড়িয়ে ভাঙছিল—"

মনাই চোখ বড় করে শুনছিল। বলল, "তোমার ভয় করল না জেঠু ?"

"ভয় তো করেইছিল। মনে হল, কী দেখছি ! এ কি মানুষ ? এমন সময়ে মূর্তিটা তার হাতের জিনিসটা শাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কীরকম একটা নীল-সবুজ আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভয় পেয়ে চেঁচাতে যাচ্ছি, তখন মূর্তিটা ডোবার ধারে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস দেখতে পেলাম, তার বাঁ হাতে মনে হল কী একটা পুঁটলি ধরে আছে। ডান হাতে একটা ছোট লণ্ঠন। পলতে খুব নামানো, আগুন দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। শাঁকচুন্নি কি অন্য কেউ লণ্ঠন নিয়ে রাত্রে বের হয় না।

"যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন দেখি হালখড়িয়াদা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে, 'বলি ইস্কুলে যেতে হবে না, কখন রোদ উঠে গেছে, বড়মা ফিরে এলে তাকে বলিয়ে দেব।' শুনে আমার এত রাগ হল যে রাত্রে কী দেখেছি ভুলে গেলাম। মনে পড়ল ইস্কুলে গিয়ে টিফিনের সময় কাকে বলব ? কেই বা বিশ্বাস করবে যে আমি রাত্রে পেত্নি-টেত্নি দেখেছিলাম। আমার প্রাণের বন্ধু মণ্টু সেদিন ইস্কুলে আসেনি। ধীরেনদাকে বললাম, 'জানো, কাল রাত্রে কী হয়েছিল ?' সে তখন ফুটবলে পাম্প করছিল। খেলার দেরি হয়ে যাবে বলে সে আর কিছু শুনতে চাইল না। বলল, 'কী আর দেখেছিস, স্বপ্ন দেখেছিস।' তাড়া খেয়ে আর কিছু বলা হল না। কিছুদিন আগে দেশভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা অনেকে মনে করেছিলেন, হোক না, দেশের ভিটেয় তো থাকা যাবে। এক বছরের মধ্যে এ ধারণা বদলে গেল। কলকাতা যাবার জন্য লোকে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জলের দামে বাড়ি বেচে দেওয়া হতে লাগল। আমি ছুটিতে কলকাতা গিয়েছিলাম। আর ফেরা হল না। আমাদের বাড়ি শুনলাম পাকিস্তান সরকার দখল করে নিয়েছে। কলকাতায় এসে মাসতিনেক পরে ইস্কুলে ভর্তি হলাম। আরও কিছু দিন পরে জানতে পারলাম রাধামাধবের ভাই গৌরমাধব বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে এসেছেন। তিনি নাকি নৈহাটিতে একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়েছেন। দেশের বাড়ি বিক্রির টাকাতে সেখানে এক টুকরো জমি কিনেছেন। তাঁর ভাগ্নির কী হল সে কথা কেউ জানে না।

"তারপর ছ' বছর কেটে গেছে। আমি তখন কলেজে পড়ি। অনেকটা লম্বা হয়েছি। ধুতির সঙ্গে টুইলের শার্ট পরি। চশমা নিতে হয়েছে। পুজোর সময় সবাই কাশী বেড়াতে

গিয়েছি। বিকেল হলেই দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বেড়াতে যেতাম। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের গলির চেয়ে আমার বাঙালিটোলার গলি বেশি ভাল লাগত। সেদিনও বাঙালিটোলার গলিতে ঢুকে কয়েকটা পা গিয়েছি এমন সময় বাঁ দিকে একটা দোকান চোখে পড়ল। আগে কখনও লক্ষ করিনি। দোকানে সামনের দিকে একটা হিন্দুস্তানি ছেলে আমারই মতো বয়স, ফুলুরি বিক্রি করছে। আসল দোকান পিছনে। সেখানে অনেক রকম জিনিস ডাঁই করে রাখা রয়েছে। সস্তার কম্বল, নামাবলী, ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুর-দেবতার ছবি, রুদ্রাক্ষের মালা, সস্তার ধূপদান, শঙ্খ, আসন। দোকানে লোকের যাওয়া-আসা আছে, তবে সবাই ফুলুরির খদ্দের। আমি চলে যাচ্ছি এমন সময় সেই ভদ্রমহিলা ফুলুরি-বেচা ছেলেকে চেঁচিয়ে কী যেন বললেন। গলার স্বর না শুনলে চিনতে পারতাম না। আগে রোগা ছিলেন, এখন অল্প মোটা হয়েছেন। পরনে ধোপাবাড়ির পাটভাঙা থান। আমি তাঁকে চিনলাম বটে, কিন্তু আমাকে তিনি চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। অনেকদিন আগে আমাকে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলতে দেখেছেন। এখন আমার লম্বা ধুতি, চশমা, গোঁফের রেখা কিছুই তাঁর জানা ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা হিন্দিতে ছেলেটিকে বললেন, 'দেখ, বাবু কী মাঙছেন।'

আমি ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। উল্কির দাগ মিলিয়ে যায় না। উল্কিতে ডান হাতে স্পষ্ট লেখা আছে 'জয়গুরু'। কী ভেবে তাঁকে কিছু বললাম না। আমার দরকার ছিল না, তবু একটা ঠোঙায় দুটো আলুর চপ নিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসলাম।"

মনাই এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার বলল, "তারপর কী হল?"

আমি বললাম, "আর কী, গল্প তো শেষ হয়ে গেল।"

মনাই বলল, "ছাই গল্প। রাধামাধববাবুর টাকা-পয়সা, ধনরত্ন এসবের কথা তো কিছু বললে না; সেগুলো কোথায় গেল?"

আমি বললাম, "তা তো কিছু জানি না।"

মনাই বলল, "তোমরা তুলসীগাছের তলাটা খুঁড়ে দেখলে না কেন? দেখতে একটা বড় বাক্সে হয়তো অনেক টাকা, গয়না, হিরে-মোহর সব জড়ো করা আছে।"

আমি বললাম, "তুই কী করে জানলি যে ওখানে থাকতে পারে?"

মনাই বলল, "অনেক গল্পে ওরকম হয়। বড় ঘটিতে করে মাটির তলায় পুঁতে রাখতে হয়।"

আমি বললাম, "অত সোনা, হিরে দিয়ে কী হবে? তুই পেলে কী করতিস?"

মনাই বলল, "সোনার গয়না-টয়না সব রেখে দিতাম, বড় হলে আমার মাপের গয়না গড়িয়ে নিতাম, সব লেটেস্ট ফ্যাশানের।"

আমি বললাম, "হিরেগুলো নিতিস না?"

মনাই বলল, "না, কী সাদা ফ্যাকফ্যাক করে, আমার ভাল্লাগে না। ওগুলো মাকে দিয়ে দিতাম।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

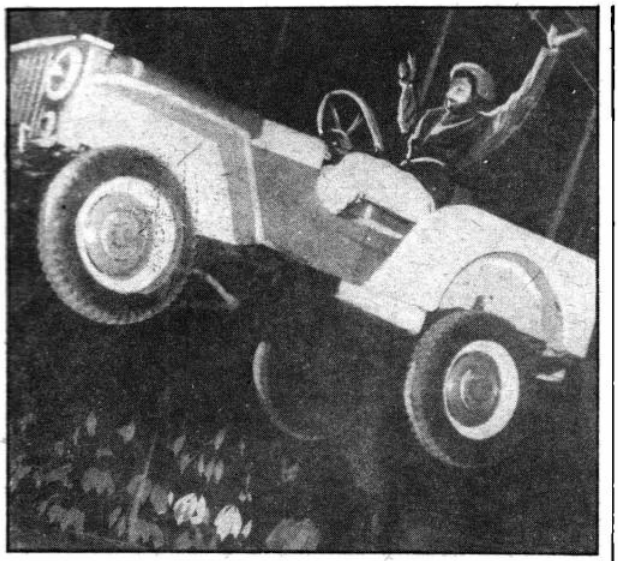

তাঁবুর মধ্যে বাঘ

শীত যে পড়েছে, টের পেলুম সার্কাসের তাঁবু দেখে। পেল্লায় পেল্লায় তাঁবু খাটানো হয়েছে শহর কলকাতার অন্তত তিন-তিনটে পার্কে। মার্কাস স্কোয়ারে 'জেমিনি', টালা পার্কে 'অলিম্পিক', আর পার্ক সার্কাস ময়দানে 'গ্রেট রেমন সার্কাস' রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে। হাওড়া ময়দানে জমে উঠেছে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস'-এর খেলা। রকমারি আলো, নানা কসরত-এর রঙিন পোস্টার, মাইকের ঘোষণা, টিকিটঘরের লম্বা কিউ, কচি-কাঁচাদের উপচে পড়া ভিড়, কলকাকলি, ফুচকা, আইস্‌ক্রিম, পপকর্ন আর ভেলপুরির হাঁকডাক—জমজমাট হট্টমেলার আসর।

টুম্পা, তাতার, লাডলি, টুকাই আর তাদের মা-মাসিদের পিছু-পিছু ভিতরে ঢুকে পড়লুম। ওম্মা, খেলা যে শুরু হয়ে গিয়েছে! ঘেরাটোপের ভিতরে বাঘ-সিংহের মাঝখানে ছপ্‌টি হাতে একা দাঁড়িয়ে রিংমাস্টার। একটুও ভয়ডর নেই! এক্ষুনি বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দেবে নাকি? উঁহু, বলব না। সবকিছু ফাঁস করে দিলে মজাটাই মাটি। ... এমনি কত রকমারি খেলা। ভারসাম্যের খেলা, জিমন্যাস্‌টিক্‌স, জাগলারি, ওয়েটলিফটিং, অব্যর্থ নিশান, উড়ন্ত গাড়ি, গোলঘরে ১২০ কি·মি· বেগে মোটর সাইকেলে নাগাড়ে পাক খাওয়ার ঝুঁকি, শূন্যে একক ব্যালান্সিং ট্রাপিজ, স্কুটার-চালক আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি, মোটরবাইক চালনারত হিমালয়ের ভালুক, যূথবদ্ধ হাতির ট্যুইস্ট নাচ, ব্যাটিং ও একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে কুর্নিশ, কাকাতুয়ার রিকশা টানা, আগুন-চাকির মধ্য দিয়ে বাঘসিংহের অব্যর্থ লাফ, কু-ঝিক-ঝিক রেলগাড়ি, খুদে জোকারদের বিচিত্র কৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি। মাইকের ঘোষণা শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসলুম। লাস্ট ইভেন্ট—প্রায়-অন্ধকার ডিমলাইটে বিপজ্জনক ট্রাপিজের খেলা। গভীর শূন্যে ডবল ভল্ট, ট্রিপল ভল্ট ও নিখুঁত ক্রসিং, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যখন সবাই দেখছি তখনই একসঙ্গে জ্বলে উঠল সবগুলো আলো। খেলা শেষ।

—অনির্বাণ দত্ত

নিপাতনে সিদ্ধ

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুর ছাগশিশু চিক্কণগাত্র,
মনে হয় ছিল বুঝি পাণিনির ছাত্র।
শিশুকালে টলমল চারখানি শ্রীচরণ,
তখন থেকেই তার মুখস্থ ব্যা-করণ।

বন্ধু বেড়াতে যান গঙ্গার বক্ষে,
ছাগ বধ হয়ে গেল এই উপলক্ষে।
আমি জানি বন্ধুর প্রেশার-কুকার নেই,
সুসিদ্ধি মাংসের হল তবে কী করেই?

বন্ধুকে এই কথা জিজ্ঞেস করতেই
হেসে বলে, 'সে কী, তোর এ-কথাটা মনে নেই?
শৈশব হতে ছাগ ব্যা-করণে ঋদ্ধ,
সহজেই হল তাই নিপাতনে সিদ্ধ।'

টিনটিন

অবিশ্বাস্য ! অদ্ভুত ! সবই উল্টে গেল !
মুদ্রা-বিনিময়
ওরে হঠকারী হনুমান ! ওরে অবিমৃশ্যকারী অলম্বুষ ! ফের যদি চালাকি করিস তো ঘাড় মটকে দেব!
তোদের উপরে নজর রাখছি !
ভাল দেখার জন্য চাই ভাল চশমা
কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন ?
কিছু না···এইটে পড়ো ! অবিশ্বাস্য ব্যাপার !
বর্ডুরিয়া-সিলডাভিয়া সংঘর্ষ
বর্ডুরিয়ার জঙ্গি-বিমান সিলডাভিয়ার বিমানকে মাটিতে নামতে বাধ্য করেছে
"আকাশ-সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে"
জোহোদে আজ সন্ধ্যায় বিমান-মন্ত্রকের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সিলডাভিয়ার একটি বিমান আমাদের
"অন্যায়ভাবে আমরা আক্রান্ত"
ক্লো থেকে সিলডাভিয়ার বিদেশ মন্ত্রক আজ জানায় যে, অন্যায়ভাবে তাদের বিমানকে তাড়া করা হয়েছিল।
আরে, এই প্লেনেই নিশ্চয় ক্যালকুলাস ছিলেন। তাহলে তো বর্ডুরিয়ার লোকদের হাতেই ফের পড়েছেন তিনি।
এই নিন ক্লোর টিকিট
ক্লোর বদলে আমরা জোহোদে যাব।
টিকিট পাওয়া যাবে?
জোহোদের প্লেনের সমস্ত আসন ভর্তি। অবশ্য শেষ মুহূর্তে যদি কেউ···
যাত্রা বাতিল করেন, তাহলে হয়তো টিকিট আপনারা পেতেও পারেন।
হুম্, এরা জোহোদে যেতে চায় ! শেষ দুটো টিকিট তো আমরা কেটেছি। হুম্ !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মেজদার সঙ্গে যাত্রা দেখা

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

বেশ ঠেস দিয়েই কথাটা বলল মেজদা। "তোদের এই পোড়া দেশে না আছে কোনো থ্রিল, না কোনো অ্যাডভেঞ্চার। লাইফটা একেবারে বোর হয়ে গেল।"

হাতিবাগানের ছেলে, খাস কলকাত্তাইয়া মেজদা ইংরিজির মিশেল দিয়ে বাংলা বলে। শরীর থেকে শহুরে পালিশটুকু ঝরে যায়নি তখনও।

মেজদার আক্ষেপটা অবশ্য নেহাত মিথ্যে ছিল না। কারণ আমাদের আধা-শহরে আমোদপ্রমোদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। বিশ মাইল দূরে জেলা-সদর। সেখানে আমরা ন'মাসে-ছ'মাসে একবার সিনেমা দেখতে যেতাম। আমাদের আধা-শহরে অবশ্য শীতকালে কখনও-কখনও সার্কাস আসত। গরমকালে হত ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফি বছর কালীপুজোর সময় কলকাতার যাত্রা আসত। তা ছাড়া, পুজোর মরসুমটাতে পাড়ার দাদারাও মাচা বেঁধে থিয়েটার করতেন। আশপাশের গ্রামগুলিতেও একনাগাড়ে যাত্রার আসর বসত। আজ এ-গাঁয়ে, কাল সে-গাঁয়ে। আমরা দল বেঁধে দেখতে যেতাম। এ-সব বাদ দিলে আমাদের আধা-শহরের জীবনযাত্রা ছিল গোরুর গাড়ির মতো মন্থর।

সেই হাতিবাগানে বোমা পড়ার পর কলকাতা থেকে আমাদের আধা-শহরে আসা ইস্তক এই সব কথা বলতে শুরু করেছে মেজদা, যেন হাতুড়ি-পেরেক হাতে আমাদের জন্মস্থানের প্রেস্টিজ পাংচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। ফুটো টায়ারে তাপ্পি লাগানো আধা-শহরের মতো আমাদের আধা-শহরের ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টায় আমি বললাম, "দাঁড়াও না মেজদা, পুজোটা একবার আসতে দাও। তারপর দেখবে অ্যাডভেঞ্চার আর থ্রিলের ছড়াছড়ি।"

মুখ বেঁকিয়ে মেজদা বলল, "কেন, সেই সময় বছরের সব জমানো থ্রিল আর অ্যাডভেঞ্চারগুলো হাইবারনেশন থেকে জেগে উঠবে নাকি?

হাইবারনেশন শব্দটার অর্থ আমার জানা ছিল না। কিন্তু আমি উচ্চবাচ্য করলাম না, অযথা ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য।

বিল্টু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "উসকো মতলব?"

অর্থাৎ, হাইবারনেশন কথাটার মানে কী?

বিল্টুরা তখন সদ্য-সদ্য বিহারের যশপুর থেকে এখানে এসেছে। ও তখনও ভাল করে বাংলা বলতে শেখেনি। ছোট-ছোট বাক্যগুলো পুরোপুরি হিন্দিতেই বলত। মেজদা বলত, বিল্টু নাকি হিন্দির তেলে বাংলাটাকে ভেজে নিয়ে হাতে-গরম পাতে দেয়। ধনা ময়রার পকৌড়ির মতো।

বিল্টুর প্রশ্ন শুনে মেজদা ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, "হাইবারনেশন বোঝো না? কক্সকম্ব কোথাকার। হাইবারনেশন মানে শীতকালীন ঘুম।"

তবুও বিল্টুর ধন্ধ যায় না। বিল্টু বলল, "লেকিন মেজদা ঘুমের আবার শীত-গ্রীষ্ম কী? ঘুম ইজ ঘুম।"

মুখ গম্ভীর করে মেজদা বলল, "না, কিছু কিছু প্রাণী আছে, যারা সারা শীতকালটা টেনে ঘুম দেয়। তারপর শীত শেষ হলে গা-গতর ঝাড়া দিয়ে ঘুম থেকে ওঠে।"

বিল্টু গোল-গোল চোখ করে বলল, "আই বাস্।"

খানিকটা তাচ্ছিল্য করে বিল্টুর সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে মেজদা বলল, "হ্যাঁ, থ্রিলের কথা কী যেন বলছিলি ?"

আমি বললাম, "পুজোর পর থেকেই শুরু হবে যাত্রা-থিয়েটার। প্রতি রাতেই। আজ এ-গাঁয়ে, কাল সে-গাঁয়ে ! তখন প্রতিরাতেই থ্রিল। থ্রিলের ছড়াছড়ি। মাঠ-পাথার পেরিয়ে, পাহাড়-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হেঁটে জোছনা-রাতে যাত্রা দেখতে যাওয়া, আবার চাঁদ ডুবে যাবার আগেই বাড়িতে ফেরা, সে একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।"

বিল্টু সায় দিয়ে বলল, "সহি বাত মেজদা। তারপর যদি নসিবে থাকে, তাহলে জঙ্গলের রাস্তায় বাঘ বা ভালুর সঙ্গে মোলাকাতও হয়ে যেতে পারে। সেও একটা দারুণ থ্রিল।"

মেজদা ঝটিতি বলল, "না না, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে মোলাকাতটা খুব বাজে ব্যাপার। জন্তু-জানোয়াররা কোনো সময়ই মানুষদের ওপর খুশি নয়। ওদের সঙ্গে ভেট-মোলাকাতের ইচ্ছে নেই আমার।"

বিল্টু বলল, "মেজদা ডর গয়া।"

মেজদা গর্জন করে বলল, "ডর গয়া মানে ? আমি কোনোদিন কাউকে নেহি ডরা হ্যায়, বুঝা ?"

বিলটু বলল, "স্রেফ নিতাইজেঠুকো ছোড় কর্।" অর্থাৎ নিতাইজেঠু বাদে। নিতাইজেঠু মেজদার বাবা।

মেজদা মোলায়েম গলায় বলল, "বাবার কথা তুলছিস কেন। বাবা কি বাঘ না ভালুক ? বাবা ইজ বাবা। বাবাকে ভয় করতে হয়, শাস্ত্রের বচন। তা সে যাই হোক, তোদের এই যাত্রা দেখার ব্যাপারটাতে বেশ ইন্টারেস্টেড ফিল করছি। তাহলে পুজো পর্যন্ত দেখাই যাক। তারপর নাহয়....."

অসমাপ্ত কথাটার মধ্যে একটি মৃদু হুমকির আভাস ছিল। অর্থাৎ, তারপর নাহয় কলকাতায় ফিরেই যাবে মেজদা। ওদিকে তখন জাপানি বোমার ভয়ে অর্ধেক কলকাতা উজাড়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, মেজদাকে থ্রিল আর অ্যাডভেঞ্চার সাপ্লাইয়ের জন্য এবার পুজোর মরসুমে একটাও যাত্রা আর থিয়েটার বাদ দেওয়া হবে না।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। কিন্তু সেবার কী একটা কারণে আমাদের পাড়ার দাদাদের যাত্রা-থিয়েটার বন্ধ রইল। অর্থাৎ আমাদের থ্রিল অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামের পয়লা কিস্তিই বরবাদ।

বিল্টু বলল, "ঘাবড়াও মাত মেজদা। ঘরকি মুরগি ডাল বরাবর। আমরা নজদিগের গাঁওগুলোতে যাত্রা দেখতে যাব। তখন খালি মজাহি মজা।"

অর্থাৎ মজা আর মজা। যাই হোক, তার জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। বিল্টুই খবর নিয়ে এল, মাইল তিনেক দূরে কাঞ্চনপুর গাঁয়ে লক্ষ্মীপুজোর রাতে যাত্রা হবে। পালার নাম কর্ণার্জুন। মেজদা বিশেষ উৎসাহিত, কারণ কলকাতার স্টেজে ও কর্ণার্জুন থিয়েটার দেখেছে।

বিল্টু বলল, "একেবারে হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। বাঁকুড়া শহর থেকে ড্রেসার-পেন্টার আসছে। সঙ্গে বাছাই করা কনসার্ট পার্টি। বদি মাস্টারের কর্নেট, ভোলা ওস্তাদের মৃদঙ্গ, বাঁকে মিশিরের সারেঙ্গি।"

সন্ধেরাতেই খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা রওনা হলাম। শহরের শেষে একটা পাহাড়ি নদী। তার ওপারে শ্মশান। তারপর একটা ছোট জঙ্গল পেরিয়ে কাঞ্চনপুর। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে।

মেজদা কলকাতার থিয়েটারের গল্প বলছিল। "থিয়েটার দেখতে গেলে কলকাতা। স্টার, শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, মিনার্ভা। আর কী বাঘা-বাঘা আর্টিস্ট ! শিশির ভাদুড়ী, অহীন চৌধুরী, নরেশ মিত্তির। কী সিন-সিনারি, কী আলোর বাহার ! ঘন্টা রে, না দেখলে তুই কল্পনা করতে পারবি না।"

বিল্টু বলল, "কলকাতার সব হলগুলোতে তুমি থিয়েটার দেখেছ ?"

মেজদা বিরক্ত হয়ে বলল, "না তো কী ? আমরা থিয়েটারপাড়ায় থাকি, জানিস ? থিয়েটার দেখাটা আমাদের

সুস্বাস্থ্যের জন্য আসল আয়ুর্বেদিক টনিক এখন নতুন সাজে

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ

শক্তি আর পুষ্টি দিতে ৪ ভাবে সমৃদ্ধ

১ ৪৮টি প্রয়োজনীয় এবং অবিষাক্ত গাছ-গাছড়া ও উপাদান দিয়ে তৈরি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে বছরভোর আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।

২ সর্দি-কাশি এবং শারীরিক দুর্বলতার মহৌষধ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। কারণ, একমাত্র এই চ্যবনপ্রাশেই আছে ৪টি বিশেষ উপাদান– মকরধ্বজ, অবর্কভস্ম, শৃংভস্ম এবং কেসর।

৩ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ যোগায়। অন্যান্য টনিকের মতো রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নয় বলে এই ভিটামিন ও খনিজ সহজেই শরীরে মিশে যায়।

৪ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষেই উপকারী। বড়দের জন্য প্রতিদিন দু'বার এক চামচ করে চ্যবনপ্রাশ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, পুষ্টি যোগায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দু'বার এক চামচ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ শীতের নানান রোগ বালাই ঠেকিয়ে রাখে।

এখন আধুনিক আকর্ষণীয় পলিপ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে

বৈদ্যনাথ

৫টি আধুনিক কারখানায় ৭০০-রও বেশি আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে

শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন লি:

CLARION C-BNCP-1

পারিবারিক ঐতিহ্য।"

বিল্টু একেই বাংলা ভাল বুঝতে পারত না। তারপর ওই সব শক্ত-শক্ত শব্দ। সে শুধু চোখ বড় বড় করে বলল, "আই বাস্।"

গল্প করতে-করতে কখন যে কাঞ্চনপুরের সীমানায় এসে পৌঁছেছি খেয়াল নেই। দূর থেকে নজরে পড়ল, আলোর রোশনাই। কোলাহলও শুনতে পেলাম। বাঁকটা পার হতেই আসর চোখে পড়ল। গাঁয়ের বুড়োশিবের থানে আসর খাটানো হয়েছে। মাথার ওপর ঝালর দেওয়া শামিয়ানা। কোণে কোণে জোরালো হ্যাজাক। এক পাশে বাদ্যযন্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা।

জমায়েত শুরু হয়েছিল, কিন্তু যাত্রা শুরু হতে পারছিল না। কারণ, দুই পাড়ার এক দীর্ঘমেয়াদি বিরোধের মীমাংসা হবে এই যাত্রাকে উপলক্ষ করে। তার জন্য চণ্ডীতলায় দফায় দফায় মাতব্বরদের মিটিং চলছে। মীমাংসার সূত্রটা তৈরি হতে যা বাকি।

দ্বিতীয়ত, ওরা আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছিল। কারণ ওরা খবর পেয়েছিল যে, কলকাতার বাবুরা ওদের যাত্রা দেখতে আসছে। আসলে মেজদার সঙ্গে ওরা আমাদেরও কলকাতার বাবু বলেই ধরে নিয়েছিল।

খানিক পরে বিরোধ-নিষ্পত্তির খবর এসে পৌঁছল, এবং তখনই কনসার্টের প্রথম ঘন্টা পড়ল। এক প্রস্থ কনসার্ট শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ঘন্টা পড়ল। এবার আবার কনসার্ট, দ্রুত লয়ে। তারপর তৃতীয় ঘন্টার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল নাটক। প্রথমে সখীদের নাচ। তারপর আসল পালা। শুরু থেকেই বেশ জমে গেল। যেমন বক্তৃতা, তেমনি গান, তেমনি নাচ। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, যখন কর্ণর বক্তৃতা চলছে, তখন দক্ষিণ দিকের দর্শকরা মুহুর্মুহু ক্ল্যাপ দিচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিকের দর্শকরা একবারে কাঠের পুতুলের মতো নীরব নিস্তব্ধ। আবার যখন অর্জুনের বক্তৃতা চলছে তুঙ্গে, তখন উত্তর দিকের দর্শকরা করতালিতে ফেটে পড়ছে, কিন্তু দক্ষিণ দিকের দর্শকদের মুখে কুলুপ আঁটা। ওরা তখন পাথরের মূর্তির মতো, নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়া যে পার্টি ভাগ করে বসেছে, সেটা টের পেলাম খানিক পরে। সেটা কর্ণর পতন ও মৃত্যুর দৃশ্য। এই দৃশ্যে প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে কর্ণর যুদ্ধ, তারপর কর্ণর রথচক্রগ্রাস, পতন, ও মৃত্যু।

প্রথমে গদাযুদ্ধ, তারপর শূল, চক্র, বৃক্ষ, মুদ্গর, ইত্যাদি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ, সব শেষে ধনুর্যুদ্ধ। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। দর্শকরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ঘন-ঘন হাততালি দিচ্ছে। কখনও কর্ণর পক্ষ, কখনও অর্জুনের পক্ষ, হাততালির আর বিরাম নেই, কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। কিন্তু যুদ্ধ আর শেষ হয় না। সাট, অর্থাৎ পালার খাতা নিয়ে আসরের এককোণে বসে প্রম্পট করছিল ওদের মোশন-মাস্টার। সে একসময় অধৈর্য হয়ে বলল, "এবার কর্ণর পতন।"

কিন্তু কর্ণ নির্বিকার। ও সমান তালে লড়ে চলেছে। মাঝে-মাঝে আড়চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে; কারণ, এ-আসরে আমরা সম্মানিত দর্শক। মেজদার দৌলতে আমরা সবাই কলকাতার বাবু।

অর্জুনের কাছে 'কর্ণর পতন হতে পারে না ! কিছুতেই না !'

মেশন-মাস্টার শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে একটু জোরেই বলল, "এবার কর্ণর পতন ও মৃত্যু।"

দক্ষিণপাড়ার দর্শকদের মধ্য থেকে একজন দশাসই চেহারার জোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ রকম তো কথা ছিল না শোলোইনামায়, এ হতে পারে না।"

অর্থাৎ মীমাংসাপত্রে এমন কোনো বোঝাপড়া তো হয়নি যে, উত্তরপাড়ার অর্জুনের কাছে দক্ষিণপাড়ার কর্ণর পতন হবে।

আর-একজন দাঁড়িয়ে ওকে সমর্থন করে বলল, "কর্ণর পতন হতে পারে না! কিছুতেই না!"

দক্ষিণপাড়ার দর্শকরা সবাই মিলে স্লোগান দিয়ে উঠল, "না, না, কিছুতেই না।"

উত্তরপাড়াও কম যায় না। ওদের দলপতি অর্জুনের পক্ষ নিয়ে বলল, "কী, বেদব্যাসের ওপর মাতব্বরি? অর্জুনের কাছে কর্ণর পতন হতেই হবে।"

উত্তরপাড়ার দর্শকরা অমনি ধুয়ো দিয়ে উঠল, "হতেই হবে, হতেই হবে।"

ইতিমধ্যে কর্ণ আলটপকা অর্জুনের ঘাড়ে মেরেছে এক রদ্দা। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে মারল কর্ণকে এক লেঙ্গি। কর্ণ আসরের কোণে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

উত্তরপাড়ার দর্শকরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "দে কর্ণর টেংরি খসিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার দর্শকরা হৈ হৈ করে উঠল, "দে অর্জুনের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে।"

সে এক হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। যাত্রার আসর তখন রীতিমত মল্লযুদ্ধের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এতক্ষণ শুধু উতোর-চাপানই চলছিল, হঠাৎ কী একটা কথায় উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়ায় লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল।

অবস্থা গুরুতর দেখে আমরা কোনো প্রকারে বেরিয়ে চোঁচা দৌড়। গাঁয়ের শেষ সীমানায় এসে জিরিয়ে নিচ্ছি, তখন আরেক উটকো বিপত্তি। হঠাৎ একটা আড়াইমনি লাশ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। ভাঁটার মতো গোল গোল চোখ, ইয়া পুরুষ্টু গোঁফ। হাতে একটা পাকানো বাঁশের লাঠি।

মেজদার একটা হাত শক্ত করে ধরে লোকটা বলল, "এদিকে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে কোথায় পালানো হচ্ছে?"

মেজদা মিনমিন করে বলল, "মানে?"

"ন্যাকা, কিছু বোঝেন না!" লোকটা ধমকে উঠল, "জানো, এই যে যুদ্ধ তোমরা লাগিয়ে দিয়ে গেলে, তা কোনোদিন থামবে কি না কেউ জানে না। এ যুদ্ধ পাড়া থেকে পাড়ায়, তারপর গ্রাম থেকে গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর কত রক্ত ঝরবে, কত লাশ পড়বে, কত নারীদের হাহাকার, কত শিশুদের কান্না...."

লোকটা যাত্রার আর্টিস্টদের মতোই গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলছিল।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তাতে আমাদের কী দোষ?"

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "দিলে তো মুডটাকে নষ্ট করে! তা তোমাদের দোষ নেই? তোমরাই তো যত নষ্টের গোড়া। তোমাদের দেখেই তো দক্ষিণপাড়ার প্রেস্টিজ চনমনিয়ে উঠল। ওরা কেষ্টাকে মানে কর্ণকে বিষ্টু মানে অর্জুনের কাছে হার মানতে দিল না। এ রকম একটা সাম্প্রদায়িক কাণ্ড ঘটানোর জন্য তোমাদের পালের গোদা ওই কলকাত্তাইয়া মক্কেলকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম। চলো।"

মেজদা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, "কোথায়?"

লোকটা বলল, "জঙ্গলের মধ্যে, ওই ডাকাতে-কালীর মন্দিরে। ওখানে তোমাকে বলি দেওয়া হবে।"

"অ্যাঁ!" মেজদা আর্তনাদ করে উঠল।

কাণ্ড দেখে আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা। ইতিমধ্যে বিল্টু লোকটার ঠিক পিছনে পজিশন নিয়েছে। ও যখন মেজদাকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছে, তখন বিল্টু লোকটার অজান্তে ওর কোমরের কাছে কাতুকুতু দিতে লাগল। লোকটার দুটো হাতই জোড়া। ও বিল্টুকে কাবু করতে পারছিল না। ওর একটা হাতে লাঠি, আর অন্য হাতে মেজদার হাতটা ধরা। দু-একবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে তারপর হি হি করে হেসে লোকটা বলল, "অ্যাই, কী হচ্ছে, হি হি হি, ভাল হবে না বলছি, অ্যাই...."

বিল্টু তখন মোক্ষম দাওয়াই পেয়ে গেছে। ও রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। ও কখনও পিছু থেকে, কখনও পাশ থেকে লোকটাকে কাতুকুতু দিয়েই চলেছে। লোকটা প্রথমে কাঁকড়ার মতো লাফাতে লাগল। তারপর সব রকম নাচের কসরত করতে-করতে বলতে লাগল, "অ্যাই ছোকরা, কাতুকুতু দেওয়া বন্ধ কর বলছি, নইলে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলব, হি হি, হি হি হি হি...."

প্রথমে কথার মাঝখানে হাসি, তারপর শুধু হাসি। সে-হাসিও থামে না, বিল্টুর গেরিলা যুদ্ধও থামে না। ইতিমধ্যে লোকটার হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গিয়েছিল। লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি লোকটার নাকের সামনে পাঁই-পাঁই করে ঘোরাতে লাগলাম। সামনে লাঠি ঘোরানো আর পিছনে কাতুকুতু এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে লোকটা যেন চোখে সত্যিই সর্ষেফুল দেখতে লাগল। তারপর একসময় গাঁয়ের দিকে দৌড়ুতে শুরু করল সে। আমরাও পিছু-পিছু দৌড়ে গিয়ে ওকে সীমানা পার করে দিয়ে এলাম।

ফিরে এসে আমি বললাম, "যাক, নিশ্চিন্তি। লোকটাকে পগার পার করে দিয়ে এসেছি।'

বিল্টু বলল, "লেকিন আদমিটা ভারী শয়তান ছিল, কী বলো মেজদা?"

মেজদা চটে গিয়ে বলল, "কিন্তু তোরা আমাকে একটা চান্স দিবি তো! নিজেরাই লড়ে গেলি, নাহলে দেখতিস কত সহজেই ঘায়েল করে দিতাম লোকটাকে।"

বিল্টু বলল, "কিন্তু মেজদা, আমরা যখন লোকটার সঙ্গে লড়াই করছিলাম, তুমি তখন ও রকম কাঁপছিলে কেন?"

মেজদা গম্ভীর হয়ে বলল, "ওটা ভয়ের কাঁপুনি নয়, কক্সকম্ব কোথাকার। উচিকোমির প্রিপারেশনের আগে শরীরটাকে ওরকম কাঁপাতে হয়।"

"উচিকোমি কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"জুডোর একটা প্যাঁচ। কিছুই তো জানিস না, যত সব হিপোক্যাম্পাস!"

জুডোর প্যাঁচে না হলেও, আপাতত মেজদার কথার প্যাঁচেই ঘায়েল হয়ে আমরা চুপ করে গেলাম।

ছবি : দেবাশিস দেব

উয়েফা কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে রোভার্স, কিন্তু এফ·এ·কাপের পঞ্চম রাউণ্ডে হারিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেলবরোকে স্কোয়াশ খেলে নিজেকে ফিট রাখছে রয় ।

ব্ল্যাকি দারুণ মেরেছে !

রয় কি ফেরাতে পারবে ?

ফিরিয়েছে ! শাবাশ !

এবারে ব্ল্যাকির বিপদ !

যাচ্চলে !

এ-সেট রয় জিতল !

দুয়ো ব্ল্যাকি !

আর-এক সেট খেলবে ?

নাঃ, আর দম নেই ।

পরে ··· ক্লাব-রুমে···

বড্ড বেশি স্কোয়াশ খেলা কি ভাল ?

এই করেই তো ফিট থাকি ।

ক্লাব-চেয়ারম্যান স্যাম বার্লো কিন্তু চিন্তিত···

ফিট তো থাকাই চাই । কিন্তু লিগ আর এফ· এ কাপের খেলার আগে দুর্ঘটনা না বাধাও ।

হঠাৎ পা হড়কালেই তো হয়ে গেল ! ঠিক বলিনি ?

একশো বার ঠিক !

রয়কে কি ওরা চিনে ফেলবে ?

এর পরে আগামী সংখ্যায়

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও। এখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কোনোই সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে বেরিয়ে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল, তারপর আর দিপুও ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে দেখতে না পেয়ে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে গেলেন শ্মশানে এক সাধুবাবার কাছে। তারপর ...

এমন সময় দেখা গেল কারা যেন হৈ হৈ করে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। ঠিক সামনে-সামনে লাফাতে-লাফাতে ছুটে আসছে একজন লোক, সে জোরে চিৎকার করে কী যেন বলছে। তার পেছনে-পেছনে আসছে ঘোমটা-পরা একজন বউ আর দু'তিনজন বাচ্চা। সামনের লোকটির খালি পা, একটা ধুতি মালকোচা মেরে পরা।

সাধুবাবা ইরানির হাত দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন, তা শুনে সবাই চমকে গিয়েছিল। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই ঐ গোলমালটা খুব কাছে এসে পড়ল। সাধুবাবা মুখ তুলে সে-দিকে তাকালেন।

খালি-পায়ে লোকটি 'ওরে বাবা রে, মরে গেলুম রে, গা জ্বলে গেল রে, ওরে বাবা রে' বলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে এসে একেবারে হুড়মুড় করে সাধুবাবার সামনে আছড়ে পড়ল। তারপর সাধুবাবার পা চেপে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "বাঁচিয়ে দাও গো, সাধুবাবা! দয়া করো। মরে যাচ্ছি! আর সহ্য করতে পারছি না!"

ইরানি যে সাধুবাবার সামনে বসে আছে, তা লোকটা গ্রাহ্যই করল না। লোকটা ইরানির গায়ে একবার ধাক্কা মারতেই ইরানি সংকুচিতভাবে সরে গেল খানিক দূরে।

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে লোকটিকে বললেন, "আঃ, আমার পা ধরে টানছ কেন? উঠে বোসো! কী হয়েছে, ভাল করে খুলে বলো!"

লোকটি খানিকটা মুখ তুলে বলল, "সারা গা জ্বলে যাচ্ছে, আমি মরে যাব সাধুবাবা! বসতে পারছি না, শুতে পারছি না, মরে যাচ্ছি! আপনি আমাকে..."

হঠাৎ থেমে গেল লোকটি। সে দারোগাবাবুকে দেখতে পেয়েছে। এতক্ষণ তার মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছিল, এবারে সেখানে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ।

সে হাত জোড় করে বলল, "ক্ষমা করুন, দারোগাবাবু, দয়া করুন, আর কোনোদিন অপরাধ করব না। যা করেছি তার জন্য মাপ করে দিন..."

দারোগাবাবু কোমরে দু'হাত রেখে বেশ জাঁদরেলভাবে লোকটিকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর ভুরু ও গোঁফ কাঁপছে। ঠোঁটটা হাসি-হাসি।

তিনি বললেন, "আগে যেন তোমায় দেখেছি-দেখেছি মনে হচ্ছে?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমার নাম দেবীদাস, আমি একবার মেয়াদ খেটেছি।"

বড়বাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক ধরেছি! ঠিক ধরেছি! ডাকাতির কেস, তাই না?"

দেবীদাস বলল, "আজ্ঞে না, সাইকেল-চুরি!"

বড়বাবু বললেন, "ঠিক ঠিক! একবার মেয়াদ খেটেও তোর শখ মেটেনি! আবার পরপর বেশ কয়েকটা সাইকেল চুরির খবর পেয়েছি!"

দেবীদাস বলল, "আমি মরে যাচ্ছি, দারোগাবাবু, আমার চামড়া ফেটে যাচ্ছে, সারা গায়ে অসহ্য জ্বলুনি...."

বড়বাবু বললেন, "বেশ হয়েছে। পাপের শাস্তি!"

খয়েরলাল এবারে এগিয়ে এসে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান. অত সহজে কি পাপের শাস্তি হয়? এর থেকে ঢের বড়-বড় পাপী আমি দেখেছি...ওর কী হয়েছে আগে শোনা যাক

দেবীদাস মাটিতে শুয়ে পড়ে বলল, "আমি আর কথা বলতে পারছি না। ওঃ, ওঃ, ওঃ!"

ঘোমটা-মাথায় বউটি এবারে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো তাকিয়ে রইল ভয়-পাওয়া চোখে

সাধুবাবা বললেন, "ওকে নদীর জলে স্নান করিয়ে নিয়ে এসো! দ্যাখো তাতে যদি জ্বালা কমে।"

একটা বাচ্চা ছেলে বলল, "সকাল থেকে তিনবার চান করেছে! পুকুরে ডুব দিয়েছে!"

সাধুবাবা তবু তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন লোকটির গায়ে। তারপর খানিকটা মাটি ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, শান্তি, শান্তি, শান্তি! আর একটা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওর গায়ে।

দেবীদাস ছটফট করতে করতে হঠাৎ একেবারে থেমে গেল। ইরানি ভয় পেয়ে ভাবল, লোকটা মরে গেল নাকি?

দেবীদাস একটু চোখ খুলে তাকাল। ফিসফিস করে বলল, "কমেছে, অনেকটা কমেছে।"

খয়েরলাল ওর পাশে উবু হয়ে বসল। তারপর ওর চোখের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কাল রাতে কোথায় বি করতে গিয়েছিলে? সেখানে বুঝি জলবিছুটি গাছ ছিল? গায়ে বিছুটি লেগেছে?"

দেবীদাস বলল, "আজ্ঞে না, বিছুটি লাগেনি।"

সাধুবাবা বললেন, "বিছুটি হলে তো জল দিলে আরও বেশি জ্বালা করত। কেউ বোধহয় ওকে বাণ মেরেছে!"

ইরানি ভাবল বাণ মানে তো তীর। লোকটার বুকে বা পিঠে তো তীর বিঁধে নেই। সে-রকম কোনো ক্ষতও নেই।"

দেবীদাস বলল, "হ্যাঁ সাধুবাবা, বাণ মেরেছে! একটা ছোট ছেলে!"

দারোগাবাবু বললেন, "অ্যাঁ ? ছোট ছেলে ? কত ছোট ?"

খয়েরলাল বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, গোড়া থেকে সব শুনতে হবে। ওহে দেবীদাস, কাল রাতে কোথায় চুরি করতে গিয়েছিলে সেটা বললে না তো ? একদম সত্যি কথা বলবে। সাধুবাবা মন্ত্র পড়ে তোমার ব্যথা কমিয়ে দিয়েছেন, তুমি মিথ্যে কথা বললেই তিনি মন্ত্র ফিরিয়ে নেবেন।"

সাধুবাবা লোকটির কপালে আর-একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "এবারে উঠে বসো।"

লোকটি দারুণ অবাকভাবে সাধুবাবার দিকে তাকাল। মাত্র দু'তিন মিনিট আগেও সে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, এখন আর তার কোনো ব্যথা নেই।

লোকটি উঠে বসতেই খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ, তারপর ?"

দেবীদাস একবার ঢোক গিলে বলল, "কাল রাতে রামবাবুর বাগানে গিয়েছিলাম, পুকুরের ধারটায়…"

বড়বাবু বললেন, "রামবাবুর বাগানবাড়ি থেকে ক'দিন আগেই একটা সাইকেল চুরি গেছে। সেটা তোমারই কীর্তি। আবার গিয়েছিলে আরও কিছুর খোঁজে ?"

খয়েরলাল বলল, "আহা, আপনি যেমন রোজ অফিস যান, তেমনি ওকেও কাজে বেরুতে হয়। তারপর ? পুকুরধারে কী হল ?"

দেবীলাল বলল, "পুকুরধারে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। সেই যে পুকুরটার সব জল শুকিয়ে গেছে, সেই পুকুরটার ধারে।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "রাত তখন ক'টা ?"

"তা বারোটা-একটা হবে ! জানেনই তো ওই জায়গাটায় যখন-তখন ঝড়বৃষ্টি হয় !"

"যখন-তখন ঝড়বৃষ্টি হয়, শুধু ঐ জায়গাটায় ? তার মানে ?"

"আপনি নতুন লোক, তাই জানেন না। আশপাশের সব গ্রাম শুকনো, খটখটে, অথচ এখানে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, এমন তো প্রায়ই হয়।"

বড়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, এদিকটায় একটু বেশি বৃষ্টি হয় বটে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"

দেবীদাস বলল, "কাল সন্ধেবেলাতেও তেমনি হয়েছিল। আমি গেলুম বৃষ্টি থামবার পর। ওখানকার যে রান্নার ঠাকুর, সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, তার ঘরে আলো জ্বলে। সেইজন্য আমি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। তারপর একসময় একটা খোকা বেরিয়ে এল, তার হাতে একটা টর্চ না কী যেন ছিল, ঠিক দেখতে পাইনি, তবে গোলমতন আলো জ্বলছিল…"

বড়বাবু ইরানির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তো, তোমার ভাইয়ের কথা বলছে। আমি ঠিক বুঝেছিলুম, এই ব্যাটাই সব গণ্ডগোলের মূলে !"

খয়েরলাল হাত তুলে দারোগাবাবুকে চুপ করার ইঙ্গিত করে বলল, "তারপর ?"

দেবীদাস বলল, "সেই খোকাটা জাদু-মন্তর জানে বোধহয়। অতটুকু ছেলে, কিন্তু একটু ভয় নেই ! আমার ওপর কী যে একটা আলো ফেলল, অমনি আমার গায়ে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল। আমি আর তিষ্ঠোতে পারলুম না।"

দারোগাবাবু বললেন, "ঠিকই তো করেছে সে, তোর উচিত-শাস্তি হয়েছে।"

দেবীদাস বলল, "ও ছেলে আলো দিয়ে বাণ মারতে জানে !"

ইরানি বলল, "না, দিপু তো সে-রকম কিছু জানে না। দিপু টর্চ নিয়েও বেরোয়নি !"

খয়েরলাল বলল, "ছেলেটা তোমাকে বাণ মারল, তুমি তাকে কিছু বললে না ? তুমি তাকে উল্টে কিছু দিয়ে মারোনি ?"

দেবীদাস বলল, "আজ্ঞে না হুজুর ! আমি তখন নিজের জ্বালায় জ্বলছি, এক দৌড়ে পালিয়ে গেলুম !"

বড়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, "সত্যি কথা বল্ ব্যাটা ! তুই ছেলেটাকে কী করলি ?"

দেবীদাস হাত জোড় করে বলল, "সত্যি বলছি, হুজুর ! মা কালীর দিব্যি ! আমি সে-ছেলের গায়ে হাতও ছোঁয়াইনি !"

"তা হলে সে-ছেলে গেল কোথায় ?"

"কেন ? সে-ছেলে ও-বাড়িতে নেই ?"

"না !"

সাধুবাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আবার মেঘ জমেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে !"

খয়েরলাল সাধুবাবার দিকে ফিরে বলল, "এবারে বলুন তো সাধুবাবা, আপনি এই মেয়েটিকে দেখেই কী করে বললেন, ওর ভাই হারিয়ে গেছে ? কাল রাত্তিরে ওর ভাই হারিয়ে গেল আর আজ সকালেই ওর হাতের রেখায় সে-কথা ফুটে উঠল ?"

সাধুবাবা বললেন, "হাত দেখে বলিনি, ওর মুখ দেখে বুঝেছি।"

খয়েরলাল আবার জিজ্ঞেস করল, "ওর যে একটি ভাই আছে, সেটা আপনি কী করে জানলেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "আমি কী করে কী বুঝি, তা তোমাকে বোঝাব কী করে ?"

এমন সময় প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাতের শব্দ হল। তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। ঝড়েরও শোঁশোঁ শব্দ উঠল।

সাধুবাবার ছোট্ট ঘরখানা ছাড়া কাছাকাছি আর কোথাও আশ্রয় নেওয়ার উপায় নেই। সবাই সেই ঘরের মধ্যেই ঢুকল। দেবীদাসের ছেলেমেয়ে দুটিকে শুধু দেখতে পাওয়া গেল না। বাবাকে সুস্থ হয়ে যেতে দেখে তারা নদীর ধারে খেলতে চলে গেছে এর মধ্যে। দেবীদাস তার ছেলেমেয়েকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, দারোগাবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন, "উঁহু, তুমি যাবে না ! পালাবার মতলব করলে একেবারে মাথা গুঁড়ো করে দেব !"

খয়েরলাল বলল, "আমি ডেকে আনছি বাচ্চা দুটোকে।"

খয়েরলাল ওদের আনতে আনতেই ভিজে গেল একেবারে। তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল প্রলয়কাণ্ড। যেমন ঝড়, তেমন বৃষ্টি। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে সাধুবাবার ছোট্ট ঘরখানা আকাশে উড়ে যাবে। সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল মাঝখানটায়। এত জোর শব্দ হচ্ছে যে, কথা বলারও উপায় নেই। দারোগাবাবুর মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

শুধু সাধুবাবার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি। (ক্রমশ)

জংলি হাতির গল্প

প্রবীরকুমার রায়

লেখক শ্রীরায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বনপাল। কিছুদিন আগে তিনি অবসর নিয়েছেন। বনজঙ্গলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেহাত কম দিনের নয়, পঁয়ত্রিশ বছরের। এই দীর্ঘ সময়ে বহুবার তিনি জংলি হাতির সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাদের আচার-আচরণ লক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথাই লিখেছেন তিনি।

হাতি আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু জংলি হাতি দেখার সৌভাগ্য কজনের হয়েছে জানি না! দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বনবিভাগে কাজের উপলক্ষে বহুবার এই বিচিত্র প্রাণীটির সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি এবং তার স্বভাব-চরিত্র জানার সুযোগ আমার ঘটেছে।

উত্তরবঙ্গের জঙ্গল আয়তনে খুব বড় নয়। চা-বাগান এবং চাষের জন্য সরকারি সংরক্ষিত বনের বাইরে বেশির ভাগ জঙ্গলই কেটে ফেলা হয়েছে। হাতি অনেকদিন থেকেই সম্পূর্ণ সংরক্ষিত জীব। এদের সংখ্যা বেড়ে দুশোর কাছাকাছি হয়েছে এবং সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কাজেই, জঙ্গলের মধ্যে প্রায়ই জংলি হাতির দেখা মেলে। এরা আবার খাবারের খোঁজে বস্তি এলাকায় গেলেই—হাতি আর মানুষের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

হাতিরা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, কিন্তু দলছুট দাঁতাল পুরুষ হাতি বা টাস্কার, ও দাঁতছাড়া পুরুষ হাতি বা মাকলা অনেক সময়ই বেশ হামলার সৃষ্টি করে। চাপড়ামারির জঙ্গলে একটা বিশালকায় দাঁতাল হাতিকে প্রায়ই দেখা যেত। হাতিটা রাস্তার উপরে আড়াআড়িভাবে গাছ ফেলে এবং গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিত। হাতিটা ছিল বদমেজাজি। এর কাছে এগোনো অসম্ভব। অতএব রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ি জমা হলে একসঙ্গে হেডলাইট-এর আলো ফেলে এবং হর্ন বাজিয়ে হাতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই আরম্ভ হত। এই রণকৌশল কার্যকর হত অনেক সময়। তবে, এককভাবে পথ অবরোধের এমন দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না।

হাতি আগুন এবং আওয়াজকে ভয় পায়—আমাদের এই অতি প্রাচীন ধারণাও বিংশ শতাব্দীর হাতির হাতে বানচাল হতে চলেছে। গ্রামের লোকেরা হাতির দলকে তাড়াতে মশাল ব্যবহার করলে হাতি সেই জলন্ত মশালকে শুঁড় দিয়ে ছুড়ে ফেরত পাঠিয়েছে—এ-রকম অনেক ঘটনা দেখেছি। আজকালকার সভ্য হাতি আবার পটকার আওয়াজকে তোয়াক্কাই করে না। নিরুপায় হয়ে গ্রামবাসীকে বাঁচানোর জন্য বনবিভাগকে ইলেকট্রিক বেড়া ব্যবহার করতে হচ্ছে, তবে হাতির বুদ্ধির কাছে এ-ব্যবস্থাও কতদিন কার্যকর থাকবে বলা মুশকিল। চা-বাগানের কুলিদের বাড়ি ভেঙে তছনছ করার ঠেলা প্রায়ই সামলাতে হয় বনবিভাগের কর্মীদের। ঘরের দেওয়াল ভেঙে ধান বা নুন চুরি করা জংলি হাতির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম।

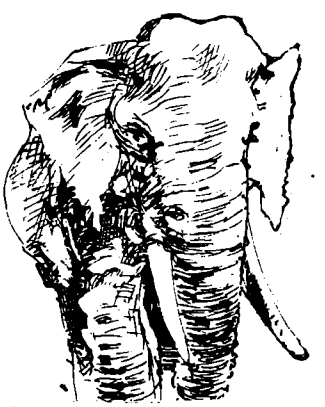

হাতি সমাজবদ্ধ জীব এবং দল বেঁধে থাকতেই তারা ভালবাসে। বিশ-পঁচিশটা হাতি ছোট-ছোট দল করে থাকে। মাঝেমধ্যে সবাই মিলেমিশে বিশাল একটা দল তৈরি করে। দলে থাকে একটি বা দুটি পুরুষ-হাতি, বাকি সবাই মেয়ে বা বাচ্চা হাতি।

বছর-দশেক আগেকার কথা। উত্তরবঙ্গে চাপড়ামারি ফরেস্ট রেস্ট-হাউসে বসে আছি বিকেলের দিকে, সঙ্গে আরও কয়েকজন সঙ্গী। তখনও জঙ্গলে সন্ধ্যা নামতে বেশ কিছু দেরি। হঠাৎ চারদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একদল হাতির আওয়াজ নানাদিক থেকে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। হাতির উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য রেস্ট-হাউসের চারদিকে গভীর পরিখা থাকে। সামনের অনেকটা জায়গা বন্যপ্রাণী দেখার জন্য বিশেষভাবে পরিষ্কার করা। তার ঠিক মাঝখানে বনবিভাগের একটা পুকুর। সারা বছরেই যেখানে জল থাকে। পরিখার ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের জন্য যে তোলা-সেতুটা আছে সেটা উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে আমরা অধীর আগ্রহে হাতির দলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট-দশেক পরেই চারদিক থেকে অসংখ্য ছোট-বড় হাতি বেরিয়ে খোলা জায়গাটা একেবারে ঢেকে ফেলল। দলে ছিল বারোটা মেয়ে-হাতি, বারোটা বাচ্চা, একটা মাঝারি আকারের দাঁতাল হাতি আর একটা বিরাট মাকলা। দেখে মনে হল এই বিরাট হাতির দলকে রক্ষা করার জন্যই দলপতি হয়তো এই ষণ্ডাগোছের মাকলাটিকে দলে স্থান দিয়েছে।

শীতকাল। জঙ্গলের নদীনালার বেশির ভাগই শুকিয়ে গেছে। জলের সন্ধানেই যে হাতির দল প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের এত কাছে এসেছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। বদ্ধ জলাশয়ের শ্যাওলা-ঢাকা জল পানের উপযুক্ত কিনা সেটা পরীক্ষা করতেই বোধহয় একটা মেয়ে-হাতি এগিয়ে গেল জলাশয়ের দিকে, তার বাচ্চাটিকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে।

শুঁড় দিয়ে অল্প একটু জল পান করেই সে বুঝল জলটা ঠিক পানের উপযুক্ত নয়। ফিরে এসে একটা শব্দ করে হাতির ভাষায় সেই খবর সে দলের সবাইকে জানিয়ে দিল। দলের আর কেউ কিন্তু জলের দিকে গেল না। ছোট বাচ্চাটির কিন্তু কৌতূহলের শেষ নেই। রেস্ট-হাউসের জল সরবরাহের জন্য যে কুয়োটি আছে তার তারের বেড়ার ভেতর দিয়ে কোনোরকমে ছোট দেহটা ঢুকিয়ে দিয়ে সে কুয়োর কাছে হাজির হল। কিন্তু জল অনেক নীচে থাকায় তাকে নিরাশ হতে হল। অনেক চেষ্টার পর মায়ের কাছে ধমক খেয়ে সে ফিরে এল সঙ্গীদের কাছে। অবশেষে দলপতির কাছ থেকে হুকুম এল হাতির দলটি ধীরে ধীরে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল আবার।

রাজপ্রাসাদের পাশে মরকত-বুদ্ধমন্দির

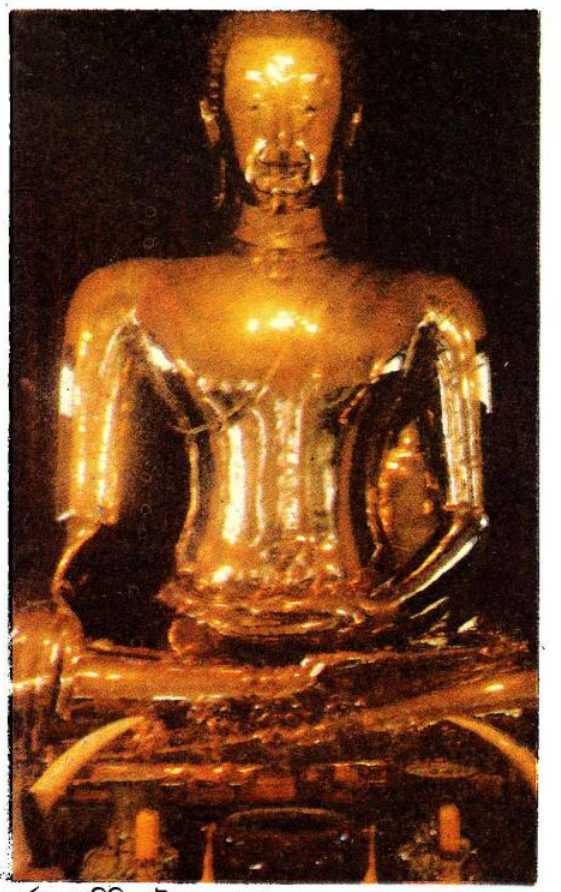

স্বর্ণবুদ্ধ, চারিদিকে উজ্জ্বল আলো

নন্দনপুরী ব্যাঙ্কক

অজিতকুমার ঘোষ

বোম্বাই থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে যখন আকাশে উড়লাম, তখন আশা ও উদ্বেগে মন বেশ উত্তেজিত। চলেছি সূর্যোদয়ের দেশের উদ্দেশে। টোকিও ও কিয়োটোতে ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অব হিউম্যান সায়েন্সেস ইন এশিয়া অ্যাণ্ড নর্থ আফ্রিকার অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে অংশ গ্রহণ করবার জন্য এই যাত্রা। যাত্রাপথে আছে ব্যাঙ্কক ও হংকং আর ফেরার পথে ম্যানিলা ও সিঙ্গাপুর। বোম্বাইয়ের এস ও টি সি এই প্যাকেজ টুরের ব্যবস্থা করেছেন।

বোম্বাই বিমানবন্দরের দিকে রওনা হবার আগে এয়ারপোর্ট প্লাজা হোটেলে আমাদের লাঞ্চ ও পারস্পরিক পরিচয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে আমাদের প্রচুর আপ্যায়ন করা হল এবং ভ্রমণসূচী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় সব আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারপর একসঙ্গে বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা। এস ও টি সির পক্ষ থেকে ভ্রমণে আমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন মিসেস দালাল—বিচক্ষণ পার্শি মহিলা, বিদেশ ভ্রমণে তাঁর অভিজ্ঞতাও বহুবিস্তৃত।

বিশালাকার বিমান। প্রায় পাঁচশো যাত্রী অনায়াসে এর মধ্যে জায়গা পাবে। ভাগ্যক্রমে জানলার ধারে সিট পেয়েছিলাম কয়েকবার মাটিতে চক্র দিয়ে বিমানটি যখন আকাশে উড়ল, তখন ভারতের মাটি একবার শেষবারের জন্য দেখে নিলাম সাদা মেঘের রাশি ভেদ করে বিমানটি কেবলই উপরের দিকে উঠছে তারপর একসময় সোজা স্থির গতিতে চলা শুরু করল তামিলনাড়ুর শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ছিলেন পাশের সিটে ভদ্রলোক সহৃদয় মানুষ। দুজনে বেশ জমিয়ে গল্প শুরু করলাম। হঠাৎ দেখলাম, আকাশ একটা নয়, দুটো। মাথার উপরে নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের খেলা। আবার নীচে তাকিয়ে দেখি, আর একটি নীল আকাশ, তাতে বরফের স্তূপের মতো সাদা মেঘ জমে আছে। রাশি রাশি মেঘের মধ্যে অনেক ফেলে আসা মুখ ভেসে ওঠে। আকাশ ও সমুদ্র, এই দুয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল মিতালি চলবে।

দিল্লি বিমানবন্দরে আমাদের বিমান এক ঘন্টার জন্য থামল। কয়েকজন যাত্রী নামল, আবার বহু যাত্রী উঠল। কাচের ভিতর দিয়ে বিমানবন্দরের আলোর সাজ ও ব্যস্ত বিমানগুলির ওঠানামা দেখছিলাম। এর পর একটানা ব্যাঙ্ককের দিকে যাত্রা। কিছুক্ষণ পরে পরেই খাদ্য অথবা পানীয় আসছে।

একটু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘোষণা কানে এল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি। ঘড়িতে তখন একটা বাজে। ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরটি আকারে বিশাল, ফিটফাট, ছিমছাম, আলোর দীপ্তিতে অপরূপ এবং স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কলাকৌশলে অত্যন্ত আধুনিক। দুপুররাতে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ইত্যাদির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হল। কাস্টমস অফিসারের কী করুণা হল আমার সুটকেসটি খুলতে বললেন। খুলেই অবশ্য আবার বন্ধ করতে বললেন। বিমানবন্দরের ঘড়িতে দেখলাম, দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট। অর্থাৎ, আমাদের ঘড়ি থেকে এখানকার সময় দেড় ঘন্টা এগিয়ে। বুঝলাম, আমরা অনেক পূর্বপ্রান্তে এসেছি। তাই এখানকার ঘড়ি দেড় ঘন্টা এগিয়ে চলেছে।

এখানকার সময়ের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য আমাদের ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিতে হল। বিমানবন্দরের বাইরেই আমাদের জন্য বাস দাঁড়িয়ে ছিল। রওনা হলাম হোটেল নিউ আমেরিনের দিকে। নিউ আমেরিন বিরাট, জমকালো হোটেল। যে চওড়া রাস্তার উপর হোটেলটি অবস্থিত, তার নাম হল শ্রীঅযোধ্যা রোড। থাইল্যাণ্ড কিংবা শ্যামদেশে ভারতের দেবদেবী, পবিত্র স্থান ও পুরাণের নাম ছড়িয়ে আছে। হোটেলে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত তিনটে বাজে।

পরদিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্টের জন্য নীচে কফি-রুমে গেলাম। সঙ্গী যাত্রীদের মধ্যে অনেককেই দেখতে পেলাম সেখানে। ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখার জন্য। আমার সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রবাসী আওয়াতে আর হায়দরাবাদের আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ ইয়াদেইয়া। এঁদের দুজনের সঙ্গেই ক্রমে-ক্রমে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। শ্রীঅযোধ্যা রোড দিয়ে হাঁটছিলাম। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তা, দ্রুত গতিতে বিশালাকার সব গাড়ি ছুটে চলেছে। দু'দিকে বিরাট আধুনিক ইমারত। দোকান ও হোটেলের জৌলুস ও জাঁকজমক বিস্ময় উদ্রেক করে। মাঝে-মাঝে থাইল্যাণ্ডের নিজস্ব রীতির দু' একটি বাড়ি। কোনাগুলি বাঁকানো ও ছুঁচলো, মুখগুলি উপরের দিকে তোলা। অনেকটা তিব্বতি ঢঙের। থাইল্যাণ্ডে নূতন ও পুরাতনের হাত-ধরাধরি সহাবস্থান। একদিকে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ঐশ্বর্য ও যান্ত্রিকতার আড়ম্বর, অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কণ্ঠে উচ্চারিত 'সব্বং অনিত্তং, সব্বং অনাত্তং, নিব্বাণং সান্তম'। একদিকে ঊর্ধ্বশ্বাস মরণপণ গতি, অন্যদিকে ধ্রুব সত্যে নিবদ্ধ স্থির প্রশান্তি।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ দিয়ে থাই জনগণের যাত্রা হয়েছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে তারা দক্ষিণ চিন থেকে বাইরের দিকে চলা শুরু করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে তারা ব্রহ্মদেশ, টংকিং ও লাওসে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে তারা সুখোথাই নগরীতে তাদের রাজধানী স্থাপন করে এবং থাই জাতিরূপে সংগঠিত হয়। এই সুখোথাই যুগেই রাজা রামকামহায়েঙের রাজত্বকালে থাই জাতির ভাষা শিল্প ও স্থাপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রামকামহায়েঙ তাঁর সাহস, বীরত্ব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তিনি মহান রাম বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে থাইদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠল এবং ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্য তারা বহু পরিমাণে গ্রহণ করল। সিংহল থেকে তারা নিয়ে এল হীনযান বৌদ্ধধর্ম। সুখোথাইয়ের এই স্বর্ণযুগেই অযোধ্যায় রামাথিবোদি নামে এক রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এই রাজধানী বর্মি ও কম্বোজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়। অবশেষে ১৭৬৭ সালে বর্মিবাহিনীর কাছে থাই-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং রাজধানী অযোধ্যা বিধ্বস্ত হয়। ব্যাঙ্ককের ৮৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত এই নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে নগরীর তৎকালীন বিশালতা ও ঐশ্বর্য অনুমান করা যায়। বর্মিদের কাছে পরাজয়ের পর থাই জনগণ আরও দক্ষিণে সরে গিয়ে থনবারিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করে। রাজা তকসিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম রাম থনবারি ১৭৮২ সালে নদীতীরবর্তী গ্রাম ব্যাঙ্ককে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই রামের বংশধারাই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলছে। বর্তমান রাজা হলেন নবম রাম।

থাইরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য গর্ব অনুভব করে। তারা আমোদপ্রিয়, সহৃদয় ও প্রিয়দর্শন মানুষ। থাইল্যাণ্ডে প্রধানত থাই ও চিনাদের বাস। পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদেরই এখানে বেশি কর্মঠ ও উদ্যমী মনে হয়। রাস্তাঘাটে মেয়েদেরই তো বেশি দেখা যায়। থাইল্যাণ্ডের সংস্কৃতি নানা দেশের সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। এখানে আলো ও বৃষ্টির প্রচুর দাক্ষিণ্য, তাই চারদিকের সবুজের সমারোহ, বাজারে খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। চার কোটি আশি লাখ লোকের অধিকাংশই কৃষিজীবী। রাজধানী ব্যাঙ্ককের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লাখেরও বেশি। সমুদ্রসৈকতে মনোরম বিশ্রামের জায়গা হল পাট্টায়া।

বেলা দুটোয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম স্বর্ণবুদ্ধমন্দিরে। ভগবান বুদ্ধদেবের পদতলে নিবেদিত থাইল্যাণ্ডের ধর্মপ্রাণ জনগণ। থাইল্যাণ্ডের পথে-পথে বুদ্ধমন্দির। প্লাস্টারে ঢাকা স্বর্ণবুদ্ধমূর্তিটি মন্দির প্রাঙ্গণে স্থানান্তরের সময় হঠাৎ পড়ে যায়, এবং প্লাস্টারও জায়গায়-জায়গায় ভেঙে যায়। রাত্রে সেদিন জোরে বৃষ্টি হয় এবং ভাঙা প্লাস্টার অনেক জায়গায় ধুয়ে যায়। পরের দিন মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু মূর্তিটির ধুলো ও কাদা পরিষ্কার করবার সময় প্লাস্টারের ফাটলের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল ধাতুর দ্যুতি দেখতে পেলেন। তখন তিনি অন্যান্য ভিক্ষুকে প্লাস্টারের আবরণ দূর করে দিতে আদেশ করলেন। দেখা গেল, প্লাস্টারের আবরণতলে নিরেট সোনার মূর্তিটি রয়েছে। ওজন সাড়ে পাঁচ টন। আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর কাছে মূর্তিটির আসল মূল্য গোপন রাখবার জন্যই তার বহিরাবরণ প্লাস্টারে নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত ত্রয়োদশ থেকে চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যে মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছিল। মূর্তিটির চারদিকে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে রাখা হয়েছে।

এরপর গেলাম শয়ান বুদ্ধমন্দিরে। বুদ্ধদেবের এক বিরাট মূর্তি মন্দিরের মধ্যে শায়িত। আসলে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণলাভের পূর্ব-অবস্থাই মূর্তিটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন দেখেছি অজন্তায় অপূর্ব প্রস্তরমূর্তিটির মধ্যে। এত বড় শায়িত বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এর দৈর্ঘ্য ৪৬ মিটার এবং উচ্চতা ১৫ মিটার। বুদ্ধদেব করতলে

শয়ান বুদ্ধমন্দির, ব্যাঙ্কক

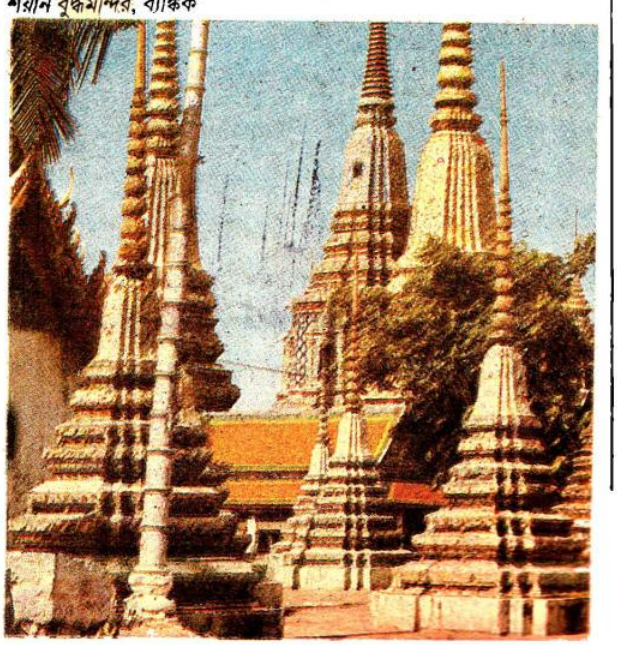

মস্তক ন্যস্ত করে শান্তভাবে শুয়ে আছেন। এক উদার স্নিগ্ধ প্রশান্তির আলোয় তাঁর বিশাল মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, চোখে অপার করুণার কিরণ। ৩৯৪টি ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্তি মন্দিরের ভিতরে চারদিকে স্থাপিত। রামায়ণ থেকে নেওয়া নানা দৃশ্য পাথরের উপর খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং পাথরের ফলকগুলি মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ রয়েছে। থাইল্যাণ্ডের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে রামায়ণের প্রভাবের নিদর্শন পুনরায় পাওয়া গেল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে নানা দোকানের সারি। ব্যাঙ্ককে তৈরি হস্তশিল্পের মনোহর দ্রব্যগুলি দোকানে সাজানো রয়েছে। কাঁটাচামচ, বাসনপত্র, ছবি, অ্যালবাম, ছাতা, হরেকরকম মূর্তি ইত্যাদির প্রচুর আমদানি হয়েছে। দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চারদিক ঝেঁপে বৃষ্টি এল। প্রবল বৃষ্টিধারা, মন্দির-প্রাঙ্গণে একহাঁটু জল। কলকাতার কথা মনে পড়ছিল। বিভিন্ন দোকানে আশ্রয় নিলাম। দোকানিরা ভারী ভদ্র ও অমায়িক, অনেকেই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। টোকার মতো কিছু ছাতাও বিক্রি হল। বৃষ্টি একটু কমলে জলের ভিতর দিয়েই আমরা অপেক্ষমাণ বাসে গিয়ে উঠলাম।

থাইদের সবচেয়ে সম্মানিত মন্দির হল মরকত-বুদ্ধমন্দির। এই মন্দিরটি রাজকীয় প্রাসাদের সংলগ্ন। রাজা ও রাজপরিবারের সকলে এই মন্দিরে উপাসনা করেন। প্রত্যেক নবঋতুর সূচনায় রাজা স্বয়ং বুদ্ধদেবের বস্ত্র পরিবর্তন করে দেন। থাইদের বিশ্বাস, যতদিন মরকত-বুদ্ধ অক্ষত অবস্থায় আছেন, ততদিন দেশের উন্নতিও অব্যাহত থাকবে। মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণের ভিতরে যেসব মন্দির ও মূর্তি রয়েছে, তাদের আকার, বর্ণ ও শিল্পসৌন্দর্যের তুলনা নেই।

মরকত-বুদ্ধমন্দিরের পাশেই রাজকীয় প্রাসাদ। এখন এই প্রাসাদে রাজা ও রাজপরিবারের লোকেরা থাকেন না। কিন্তু তবুও এই প্রাসাদ ব্যাঙ্ককের জীবন ও সংস্কৃতির প্রধান উৎসস্থল হয়ে আছে। প্রাসাদের ভিতর দুই মহল, বহির্মহল ও অন্দরমহল। বাইরের মহলে রাজা জনগণের সম্মুখে দেখা দিতেন এবং উৎসবাদিব অনুষ্ঠান হত। ভিতরের মহলে রাজা তাঁর পরিবারের লোকেদের নিয়ে বাস করতেন। বৃষ্টির বিরাম নেই। বর্তমানে রাজা ও রাজপরিবারের সকলে যে বাগানবেষ্টিত প্রাসাদে থাকেন দূর থেকে ঝাপসা গাছপালার মধ্য দিয়ে তা ভাল করে দেখতে পেলাম না। কয়েক হাত দূরে দূরে সশস্ত্র প্রহরী বিরাট বাগান এলাকা পাহারা দিচ্ছে।

পরের দিন স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ ভ্রমণের জন্য ধার্য ছিল। কফিহাউসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আওয়াতে ও ইয়াদেইয়াকে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। দূর থেকে ইন্দ্র মার্কেটের বিরাট সাইনবোর্ড চোখে পড়ত। সেই দিকেই রওনা হলাম। কয়েক তলা ব্যাপী নানা দোকানের সারি। দোকানের সজ্জা ও রকমারি আলোর বাহার চোখ জুড়িয়ে দেয়। স্বয়ংক্রিয় লিফট ও এসকেলেটারে অনবরত ওপর-নীচে করা যাচ্ছে। মূল্যবান পাথর-মূর্তি, হাতে তৈরি নানা সুদৃশ্য বস্তু, জামা-কাপড় ইত্যাদির দোকানে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। তবে দাম শস্তা মনে হল না। আমাদের নির্দিষ্ট ডলার নিয়ে চলতে হচ্ছে। অনেক কিছুই কেনার সাধ হলেও সাধ্য নেই। রাস্তায় ব্যস্ত লোকের চলাফেরা। গাড়িগুলি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে। সূর্যের তেজ কলকাতার মতো। রাস্তা দিয়ে বাঁক কাঁধে নিয়ে একটি লোক চলেছে। দুই দিকে চুপড়িতে ছোট ছোট ভাঁড়ে তালশাঁসের মতো থকথকে কী বস্তু। রোদে বেড়ে ওঠা তৃষ্ণায় তাড়িত হয়ে কাছে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ হতাশায় থমকে গেলাম। শামুক কি গুগলির ভিতরের অংশ বুঝি। একটি দোকানে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে কিছুটা শান্ত হলাম।

দুপুরের পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। নগরের শোভাই অনবরত বাইরে টেনে নিয়ে আসে। এবার আমাদের ভ্রমণসঙ্গী আরও দুই মহিলা। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ইন্দু মাথুর ও শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস। কোথায় যাওয়া হবে ? অনেক আলোচনা হল, শেষকালে ম্যাপ দেখা হল। ব্যাঙ্ককের নদীনালার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো নদী দেখা হয়নি। চাও নদীর নাম ম্যাপে দেখে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য এক ট্যাক্সিওয়ালাকে ধরলাম। ট্যাক্সি হু-হু করে চলতে-চলতে মরকত-বুদ্ধমন্দির ও রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়ে চাও নদীর ধারে আমাদের নামিয়ে দিল। মিটারে ভাড়ার অঙ্ক দেখে বেশ দমে গেলাম। যাক, ভাড়া চুকিয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগোলাম আমরা। লোকের ওঠানামার ব্যস্ততা, স্তূপীকৃত মাল, মাছের গন্ধ, দোকানপসার, ঘাটের উপর আচ্ছাদন, জেটি ইত্যাদি দেখে কলকাতার গঙ্গার ঘাট বলেই ভ্রম হয়। জেটির উপর দাঁড়িয়ে নদীর দু'ধারের দৃশ্য দেখছিলাম। চাও নদী বেশ গভীর ও খরস্রোতা। দুই পাশে বাড়িঘর, কারখানা। নৌকো করে যাত্রীরা পারাপার করছে। নদীর বুকে অনেক নৌকোর আসা-যাওয়া। তবে প্রায় সব নৌকোই যন্ত্রচালিত। নিমেষের মধ্যেই দেখা নৌকোগুলি অদেখার পারে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল নৌকো করে একটু ঘোরার। কিন্তু সন্ধে নেমে আসছিল। তাই লোভ সংবরণ করতে হল।

এবার ঠিক করেছিলাম বাসে যাব। ট্যাক্সিতে অনর্থক পয়সার অপচয় আর করব না। কোন্ বাস আমাদের হোটেলের দিকে যায়, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন থাইকে বাসের কথা জিজ্ঞেস করাতে তারা একটু রসিকতা করে বলল, এত তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরবে কেন ? ব্যাঙ্ককের জীবন একটু দেখে নাও। থাই-নাচ হচ্ছে কাছে, দেখে এসো। থাইল্যাণ্ডের লোকেরা এমনি খোশমেজাজি ও আমোদপ্রিয়। তারা খেলাধুলো, নাচগান ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। আধুনিক খেলাধুলোয় টান আছে, আবার পুরনো আমলের তরবারির লড়াই, মোরগের লড়াই, মাছের লড়াই ও ষাঁড়ের লড়াই এখনও তারা বিশেষ উপভোগ করে। সবচেয়ে জনপ্রিয় মোরগের লড়াই। ফিলিপিন ও বালি অঞ্চলে লড়াইয়ের সময় যেমন মোরগের পায়ে কাঁটা অথবা ছুরি বেঁধে দেওয়া হয়, এখানে সে-রকম হয় না। প্রত্যেক থাই-গ্রামে সপ্তাহান্তে মোরগের লড়াই হবেই। আর সেখানে জমা হবে আমোদপ্রিয় উত্তেজিত জনতা।

অনেক চেষ্টার পরে নির্দিষ্ট বাস ধরে হোটেলে এলাম। আবার বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিধোয়া রাস্তা ক্রমে জনবিরল হয়ে আসছে। কফি শপে বসে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর ঘরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার পালা। কাল সকালেই ব্যাঙ্কক থেকে বিদায় নিতে হবে।

স্পার্কো-র
এ্যাড্ভেঞ্চার-৩
জন্মদিনে বিপদ!
এক সাধু, জঙ্গলে সন্দীপকে দিলেন এক যাদু-আংটি। সন্দীপ যখনই আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, "স্পার্কো এসো, স্পার্কো এসো"—অমনি সন্দীপ স্পার্কো হয়ে যায়। (স্পার্কো-র এ্যাড্ভেঞ্চার—১ দ্যাখো)
এসো স্পার্কো... স্পার্কো-স্পার্কো
স্পার্কো হয়ে তুমি আলোর গতিতে পৌঁছে যাবে—যেখানে বিপদগ্রস্ত মানুষ তোমার সাহায্যের আশায় বসে আছে। তোমার লোহার টুপির ওপর ঐ চাকতি হচ্ছে প্রক্ষেপণ যন্ত্র—যার বোতামটা টিপলেই দুর্ঘটনার সব কিছু দেখা যাবে।
হ্যাপি বার্থ-ডে, সন্তু
ধন্যবাদ নরেন
এই যে... জনি-চিনা...
হ্যাপি বার্থ-ডে
সন্তু, তোর সব বন্ধু-বান্ধবরা কি এসে গ্যাছে? এখন মিউজিক্যাল চেয়ার খেললেই তো হয়
হ্যাঁ, এবার সুরু করা যাক, নিমা। নীলু, বাজনা ধর,
জনি আউট! দৌড়ো দেখেন... এই শীলা...!
জিতে গ্যালো দেবেন!
বাচ্চারা, সব এদিকে আয়—জল খাবারের সময় হ'ল। নিমা, পেপার-প্লেট আর ন্যাপকিন নিয়ে আয় তো...
সন্তু, দেশলাই নিয়ে আয়
সন্তু, আমি কিন্তু সব মোমবাতি জ্বালাব... তুই হয়ত নিভিয়ে ফেলবি বা উল্টে দিবি..

না - না, বরং কিছু তুই জ্বালা আর বাকি আমি... ব্যস্?
দেখলি তো, একটা কাঠিতে আমি কেমন চারটে বাতি জ্বালালাম! তুই পারবি...সঞ্জু?
1...2...3...
OUCH!
নীলু, এখানে আয়... সঞ্জু এবার কেক কাটছে
HAPPY BIRTH TO YOU. HAPPY BIRTHDAY DEAR Sanju
Nilu...fire!
BEEB BEEP
সহরের আর এক প্রান্তে সন্দীপ চিন্তিত! সে নিশ্চই একা
মা, আমার খিদে পেয়েছে; একটু কোকো গুলে দাও না...লক্ষ্মীটি!
না, তা হবে না; তুই এখন ক্লাস্ত্রে -এই ভেবে নিয়ে নিজেই তৈরী কর ... সেই সঙ্গে আমার জন্যে এক কাপ চা-ও!
আমরা তো পেহেলগাঁও থেকে অমরনাথ হেঁটে যেতে পারি — দলের সঙ্গে...
মা, তোমার ফোন এলো

FREE GIFT COUPON

Hey, Kids!

Wouldn't it be fun to have SPARKO at your side, day and night? Ask for your **FREE SPARKO gift** by filling out the details on the reverse, and posting this coupon to :

Loss Prevention Association of India Ltd.,
Post Box No. 810,
Bombay G.P.O.
Bombay — 400 001.

LPA
सुरक्षित समृद्धये

বিজ্ঞাপন

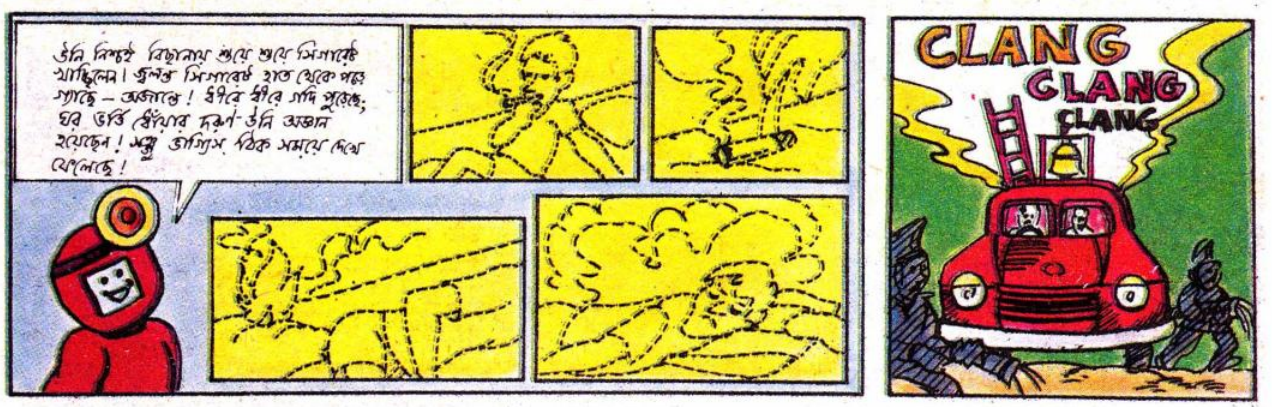

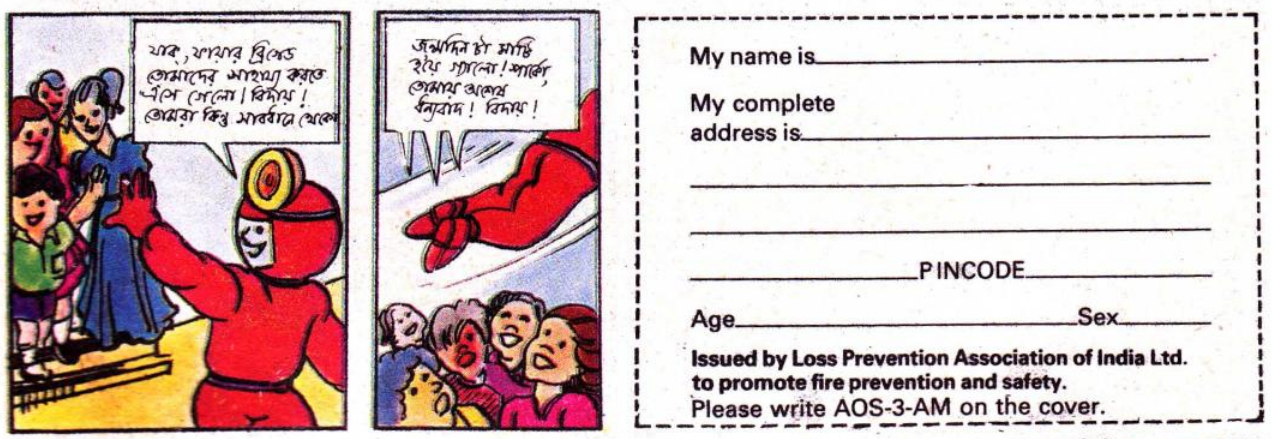

My name is_____

My complete address is_____

_____

_____

_____ PINCODE_____

Age_____ Sex_____

Issued by Loss Prevention Association of India Ltd. to promote fire prevention and safety.
Please write AOS-3-AM on the cover.

maa (n) 594/83 BEN

শীতে কে প্রথম

সাধনা মুখোপাধ্যায়

টোম্যাটোর রঙ নাকি সবচেয়ে সেরা ?
প্রতিবাদ করে ওঠে গোল বেগুনেরা।
ফুলকপি বলে, আমি সবচেয়ে সাদা।
আমিও সবুজ কত, বলে কপি বাঁধা।
শিম বলে, আমরাও ছেয়ে আছি বেড়া,
কেউ শ্যাম, কেউ কেউ আলতায় ঘেরা।
বিট্ বলে, পাটকিলে বলো আমি যদি,
আমাকে কাটলে হই ঘোর লাল নদী।
পেঁয়াজকলিটি বলে, আমিও কি কম ?
তোমরাই বলে দাও, শীতে কে প্রথম।

শীত এসেছে

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

শীত এসেছে, হিমেল হাওয়ায়
কাঁপতে থাকে দোর,
ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে
সোনার মতো ভোর।

হরেক ফুলে বাগান ছবি,
গাইছে চড়ুই গান,
ওই দ্যাখো না মাঠে-মাঠে
লুটোয় পাকা ধান।

নদীর ধারে চড়ুইভাতি
বাপ্‌রে কী হাঁকডাক,
ছুঁচের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া
গুলতি করে তাক।

এই মাসে

সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ

ঝুপ করে নামে রাত, দূরে দেখা যায়
চারিদিক ঢেকে আছে ঘন কুয়াশায়।
শুতে না শুতেই দেখি হয়ে যায় ভোর,
মনে হয় থাকি আরও লেপের ভেতর।
হাজির হয়েছে ফের সেই শীতকাল,
শীতটাকে ভারী ভয়, হই যে নাকাল।
কেন ভয়, কেন ভয়, বলছি দাঁড়াও,
শীতের দাপটে কাবু, বুঝলে না তাও ?
বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাই,
ব্যাডমিনটন খেলি আমি আর ভাই।
শীতটাকে যত কেন পাজি বলি মনে—
খুশি হয়ে যাই তবু নানা আয়োজনে,
বাড়িতে হচ্ছে রোজ হরেক খাবার,
নতুন গুড়ের পিঠে ভাল্লাগে. আর—
ফুলকপি-শিঙাড়াটা খেতে কী দারুণ,
মানতেই হবে মা'র রান্নার গুণ।
সব থেকে বেশি মজা—শোনো এই মাসে,
আমরা সবাই মিলে যাব সার্কাসে।

ছবি : দেবাশিস দেব

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

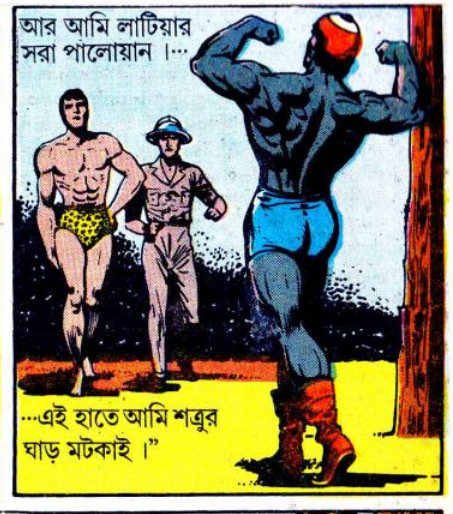

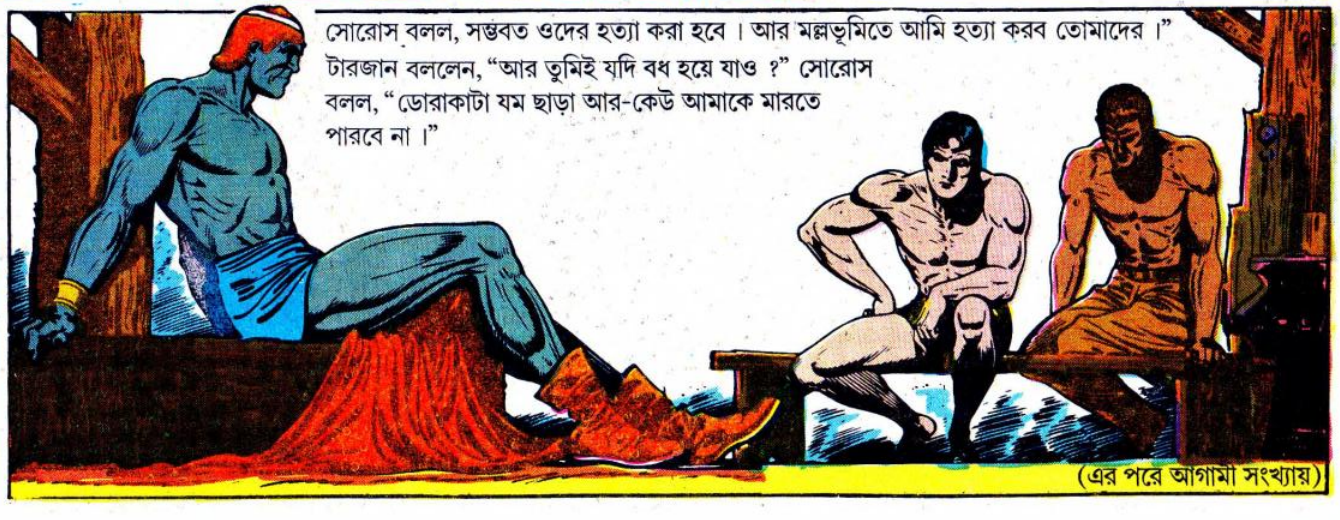

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ব্যাপারটা তাজ্জব

শৈলেন ঘোষ

একটা ছিল ছাগলছানা, আর তার ছিল এক বন্ধু বেড়ালছানা। দুটিতে খুব ভাব। বেড়ালছানার গলায় ছিল একটা ঘণ্টা। ছোট্টমতো। ছানাটা যখনই হাঁটত, ঘণ্টা বাজত, টুং-টাং। যখনই ছুটত, ঘণ্টা বাজত, টুং-টুং-টুং।

একদিন খুব সকাল-সকাল বেড়ালছানার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে সে ছুটল ছাগলছানার বাড়ি। গিয়ে বলল, "ছাগলছানা, ছাগলছানা, চ, বেড়াতে যাই।"

সেদিনের সকালটা যেন আর ক'দিনের চেয়েও সুন্দর। আলো-ভর্তি আকাশ। গাছ-ভর্তি ফুল। হাওয়া-ভর্তি গন্ধ। আঃ! ছাগলছানার মনটাও যেন বেড়াই-বেড়াই করছে! আর কি দোনোমনো করে সে! বেড়ালছানার কথা শুনে একেবারে মাথা হেলিয়ে বললে, "হ্যাঁ চ, এক্ষুনি চ।"

দুটিতে বেড়াতে বেরুল।

দুটিতে বেড়াতে বেড়াতে যখন অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, তখন তাদের সামনে পড়ল একটা ঝিল। ঝিলের জল না তো, যেন কাচ। ঝিকঝিক করছে। ছাগলছানা আর বেড়ালছানা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দেখে কী, জলের বুকে মাছ আর মাছ। সাঁতার কাটছে, ডুব দিচ্ছে, পাখনা দোলাচ্ছে, নাচছে। ছাগলছানাটার এত ভাল লেগে গেল তাই দেখে যে, সে বলেই ফেলল, "বেড়ালছানা, দ্যাখ, দ্যাখ কী সুন্দর!"

ওমা, বেড়ালছানাটা কোথায় সায় দেবে, তা না, ঠোঁট উলটিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিলে। বললে, "সুন্দর, না হাতি।" অমনি তার গলার ঘণ্টাটাও টুং-টুং করে বেজে উঠল।

ছাগলছানা বললে, "কেন বাবা, আমার তো বেশ লাগছে।"

আবার দুটিতে হাঁটতে লাগল।

একটুখানি হাঁটতেই সামনে একটা ফুল-বাগিচা। দেখতে পেয়েই, ছাগলছানা তড়বড়িয়ে ছুটল তার ভেতরে। বেড়ালছানা হনহনিয়ে হাঁটল তার পেছনে। ফুল-বাগিচায় যত ফুল, তত মৌমাছি। যত মৌমাছি, তত প্রজাপতি। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ছাগলছানা বললে, "বেড়ালছানা, বেড়ালছানা, ফুলে-ফুলে কত রঙ দেখছিস? মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিস? কী ভাল!"

ওমা! বেড়ালছানাটা নাক সিঁটিয়ে বললে, "ছাই, ভাল না আর কিছু! এর চেয়ে স্বপ্ন দেখতে অনেক ভাল!"

"স্বপ্ন!" যেন চমকে উঠল ছাগলছানাটা। যেন কথাটা এই

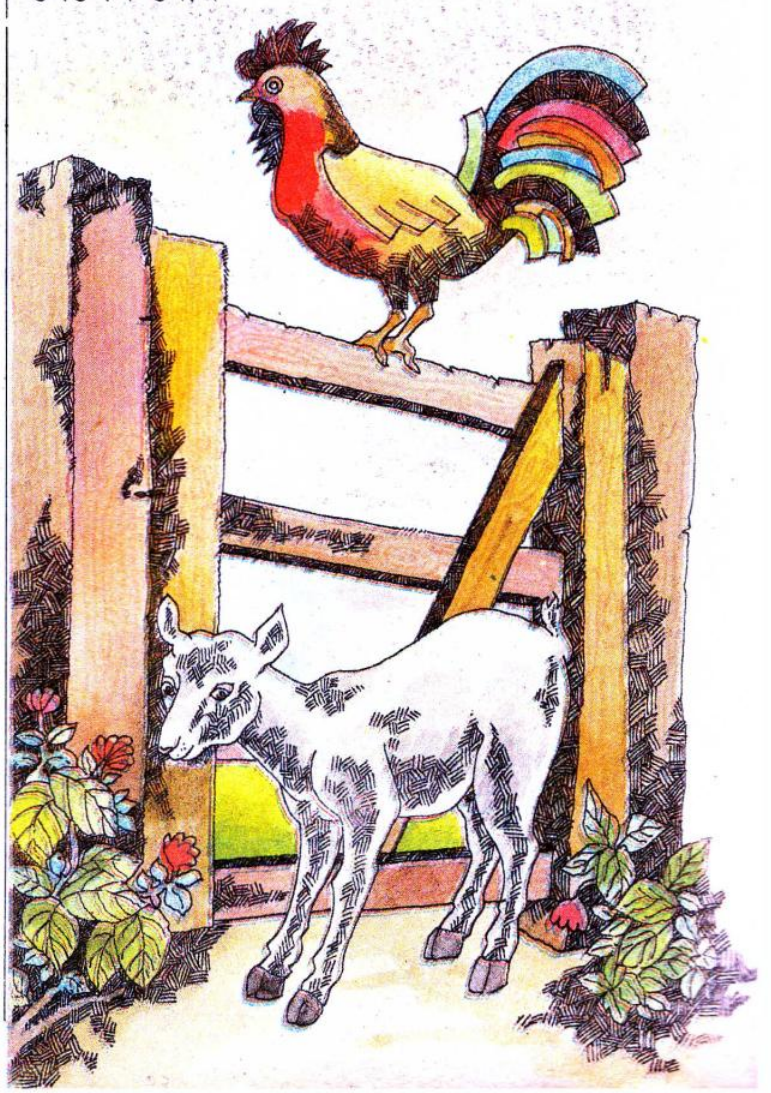

প্রথম শুনল ছাগলছানা। তাই জিজ্ঞেস করলে, "বেড়ালছানা, বেড়ালছানা, স্বপ্ন কী রে ?"

ছাগলছানার কথা শুনে বেড়ালছানা হাসতে হাসতে যায় আর কি ! খিলখিল করে তার সে কী হাসি ! তার হাসি শুনে, গাছের ছোট পাখি বড় পাখি ভয়ে ফুড়ুত-ফুড়ুত উড়ে পালাল। আর ছাগলছানাও ভ্যাবলার মতো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর বেড়ালছানার হাসি যখন থামল, তখন ছাগলছানা জিজ্ঞেস করলে, "বেড়ালছানা, অমন করে হাসলি কেন রে ?"

বেড়াল বললে, "তোর কথা শুনে !"

ছাগল বললে, "কেন, কী এমন হাসির কথা বলেছি যে, তুই একেবারে হাসতে হাসতে আহ্লাদে গড়িয়ে পড়লি ? জানি না, তাই জিজ্ঞেস করেছি।"

বেড়ালছানা আবার হেসে উঠল। বলল, "তুই কী বোকা রে ! কাকে স্বপ্ন বলে জানিস না ? তুই কোনোদিন স্বপ্ন দেখিসনি ? এ ম্যা ! আমি রোজ দেখি।"

"কোথায় দেখিস ?"

"কেন, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে।"

অবাক হল ছাগলছানা। জিজ্ঞেস করল, "ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আবার দেখা যায় নাকি ! ঘুমুলেই তো চোখ বন্ধ !"

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। চোখ বন্ধ মানেই মজার-মজার স্বপ্ন।"

"কেমন-কেমন স্বপ্ন, কী দেখিস তুই বেড়ালছানা ?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ছাগলছানা।

"সে কি আর এক কথায় বলা যায় ?"

"বল না, যতটা পারিস বল !"

তখন বেড়ালছানাটা একটুখানি কী ভাবল। তারপর ছাগলছানার মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে। হাসতে-হাসতে বললে, "তাহলে এইটুকুনি একটা স্বপ্নের কথা তোকে শোনাই। হয়েছে কী একদিন মা গান গাইছিল, আমি শুনছিলুম। শুনতে শুনতে হঠাৎ কেমন ঘুম পেয়ে গেল। চোখ দুটো যেই ঘুমে ডুবে গেছে, ও মা ! দেখি কী, আমি একটা হাতির পিঠে বসে আছি। হাতির পিঠে সোনার তৈরি একটা হাওদা, বসে আছি তার ওপর। আমার সামনে মাহুত। তার মাথায় একটা ঝলমলে পাগড়ি। আর দেখি, রাস্তার ওপর এদিক-ওদিক কত সব পল্টন। হাতে-হাতে তরোয়াল। রোদের আলোয় ঝকঝক করছে। হাতি হাঁটছে। পাশে-পাশে তারাও হাঁটছে। হাতির পিঠে দুলতে-দুলতে আমিও চলেছি। ও মা ! তারপর না কোত্থেকে প্যাঁ-পোঁ করে বাজনা বেজে উঠল ! দেখি, কতসব বাজনদার হাতির সঙ্গে হাঁটছে আর বাজনা বাজাচ্ছে ! সে কী মজা ! তারপর হাতিটা কী মস্ত একটা বাড়ির সামনে হাজির। উরি বাস ! কী পেল্লাই ! ইয়া বড়-বড় থাম। হুই উঁচু দরোয়াজা। শ্বেতপাথর আর শ্বেতপাথর। চারিদিকে শুধু শ্বেতপাথর। চোখ ঝলসে যায়। ও মা ! হাতি সেই দরোয়াজার সামনে দাঁড়াতেই দেখি, ক'জন বেহারা একটা চৌদোলা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতি আমাকে শুঁড় দিয়ে, আলতো করে জড়িয়ে ধরে তার ওপর বসিয়ে দিল। অমনি চৌদোলা দুলতে দুলতে বাড়ির ভেতর চলতে লাগল। খানিকটা আসতেই দেখি কী, এক বুড়ো-রাজা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাকা-পাকা গোঁফ, অ্যায়স্যা পাকানো ! সাদা-সাদা দাড়ি এই অবধি ঝোলানো। রাজা আমাকে দেখেই ফিক করে হেসে উঠলেন। তারপর আমার গালে টুসকি মেরে আমায় কোলে তুলে নিলেন। আমার গলার ঘণ্টাটা ধরে নাড়া দিলেন। যেই নাড়া দিলেন, অমনি টুং-টাং করে তো ঘণ্টা বেজে উঠেছে ! বাজতে বাজতে এত জোরে বেজে উঠল যে, আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। উফ্ ! আমি চমকে উঠেছি। আমার কোথায় ঘুম আর কোথায় কী ! আমি ঝটপট চোখ খুলে দেখি, মেঝের ওপর একলাটি আমি শুয়ে আছি, আর একটা কোলাব্যাঙ ঠ্যাং দিয়ে আমার গলার ঘণ্টাটা নাড়ছে। সেটা বাজছে, টুং-টাং, টুং-টাং। যাঃ ! আমার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেল !"

"সত্যি ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছাগলছানা।

বেড়াল বললে, "তোকে আমার মিথ্যে বলে লাভ !"

ছাগল বললে, "তাহলে আমি কেন স্বপ্ন দেখি না ?"

"কারণ তো নিশ্চয়ই একটা আছে," উত্তর দিল বেড়ালছানা। তারপর একটু কী ভাবল। ভেবে নিয়ে বলল, "আমার কী মনে হয় জানিস ?"

"কী ?"

"গলায় ঘণ্টা না-থাকলে বোধহয় স্বপ্ন দেখা যায় না !"

"তাই বুঝি ?"

"হ্যাঁ রে, তা না-হলে আমি দেখি, তুই দেখিস না কেন ?"

"তাহলে তোর ঘণ্টাটা আজ দে না আমায় ! স্বপ্ন দেখে, কাল ফেরত দেব।"

বেড়ালছানা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "না ভাই, মা বকবে।"

তখন ছাগলছানা বললে, "তাহলে চ, ঘরে যাই।"

তারপর বেড়ালছানা আর ছাগলছানা ঘরে ফিরল। ছাগলছানা মা'র কাছে এসে বললে, "মাগো মা, বেড়ালছানার গলায় ঘণ্টা, আমার নেই কেন ? মাগো মা, বেড়ালছানা ঘণ্টা পরে ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে। আমায় ঘণ্টা পরিয়ে দাও, আমি স্বপ্ন দেখব। আমি হাতির পিঠে চাপব।"

ছেলের কথা শুনে ছাগলছানার মা তো হেসে মরে আর কি ! বললে, "হাতির পিঠে চাপবি কী রে ?"

"বেড়ালছানা যে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে চেপেছিল !" উত্তর দিল ছাগলছানা।

ছাগল-মা হাসতে হাসতেই বললে, "চাপেনি রে, চাপেনি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল।"

"আমিও ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব। তুমি আমায় ঘণ্টা এনে দাও ! গলায় পরে ঘুমিয়ে পড়ি।"

"আমি কোত্থেকে এনে দেব !"

"আমি জানি না," বলে ছাগলছানা ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিলে।

ছাগল-মা বললে, "জানি না বাপু, ঘণ্টা পরলে স্বপ্ন দেখে, এমন কথা জন্মে শুনিনি।"

"তুমি শোনোনি তো, বেড়াল-মা শুনল কী করে ?"

মা বললে, "কী করে শুনল, বেড়াল-মাকে জিজ্ঞেস করগে যা !" বলে ছাগল-মা নিজের মনে ঘাস চিবুতে লাগল।

ছাগলছানা বেড়াল-মা'র কাছে ছুটল। "বেড়াল-মা, বেড়াল-মা, তোমার ছেলের গলায় স্বপ্ন-দেখার ঘণ্টা। ঘণ্টা পরে তোমার ছেলে ঘুমোয়, আর স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখব। হাতির পিঠে চাপব। স্বপ্ন-দেখার ঘণ্টা কোথায় পাওয়া যায় গো ?"

বেড়াল-মা বললে, "ছাগলছানা, তুই আবার স্বপ্ন দেখার

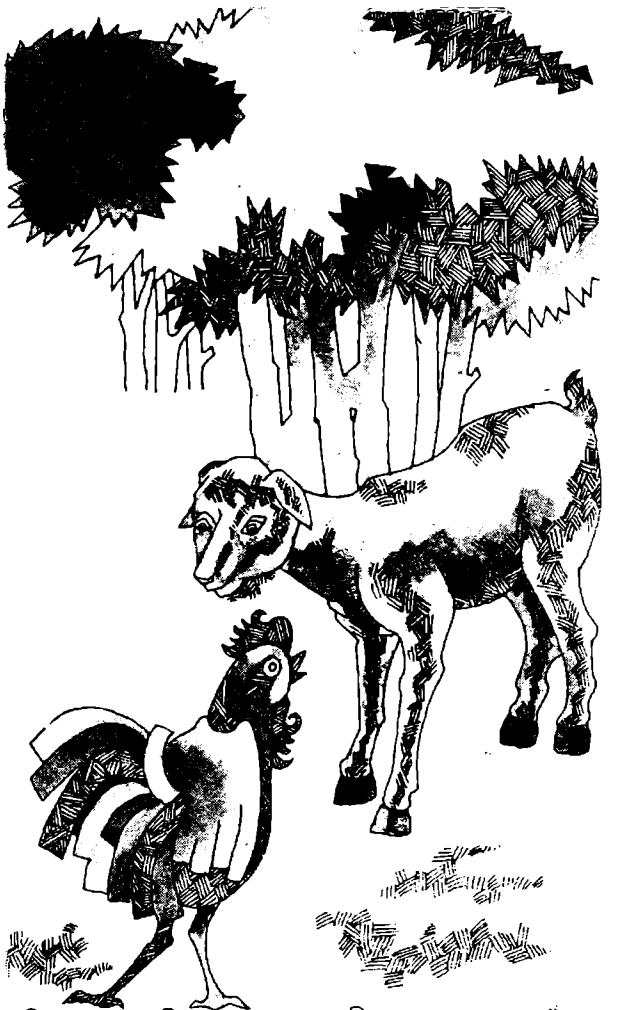

জন্যে কেন পাগল ? ছাগল কি আর স্বপ্ন দেখে !"

ছাগলছানা বললে, "বারে বাঃ ! বেড়াল যদি স্বপ্ন দেখতে পারে, তো ছাগল কেন পারে না ? তোমরাও চার পায়ে হাঁটো, আমরাও তো চার পায়ে হাঁটি। তোমাদের তো আর আধখানা পা বেশি দেয়নি ভগবান ! জানো তো বাবা বলো না কোথায় পাওয়া যায় ঘণ্টা !"

বেড়াল-মা বললে, "জানি না বাছা ! আমি তো আর আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়াই না যে, ঘণ্টা কোথায় পাওয়া যায় জানব !"

ছাগলছানা ভাবল, তাহলে বোধহয় আকাশে যারা ওড়ে তারাই ঘণ্টার খবর জানে। তাই সে খোলা-আকাশের নীচ দিয়ে মুখ উঁচিয়ে ছুটল। ছুটতে ছুটতে একটা ঝাঁকড়ামতো গাছের সামনে এসে দাঁড়াল। ঝাঁকড়ামতো গাছের ছোট্ট একটা ডালে সবুজ-সবুজ টিয়াপাখি বসে আছে। পাখি দেখে ছাগলছানা ডাক দিল, "টিয়ারানি, টিয়ারানি !"

টিয়া বলল, "ডাকছিস কেন রে ছাগলছানা ?"

ছাগল বলল, "টিয়ারানি, টিয়ারানি, বেড়ালছানার গলায় ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা পরে বেড়ালছানা ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখব। স্বপ্ন দেখার ঘণ্টা কোথায় পাওয়া যায় গো ?"

পাখি বললে, "হায় কপাল ! ছানা রে ছানা, আমি কি মাটিতে বাস করি যে, ঘণ্টার খবর রাখব !" বলে টিয়াপাখি ট্যাঁ-ট্যাঁ ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উড়ে পালাল।

টিয়াপাখির কথা শুনে ছাগল ভাবল, তাহলে বোধহয় যারা মাটিতে বাস করে তারাই জানে ঘণ্টার খবর। কিন্তু মাটিতে তো অনেকে বাস করে। কে জানে তাহলে ? ভাবতে ভাবতে ছাগলছানা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ইদিক-উদিক দেখতে লাগল।

"কোঁকোঁর কোঁ, কোঁক্ কোঁক্।"

চমকে উঠেছে ছাগলছানা। চেয়ে দেখে, একটা মোরগ গলা চড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। থমকে দাঁড়াল ছাগলছানা। একটু দেখে এগিয়ে গেল তার দিকে। ডাকল, "মোরগমিয়া, মোরগমিয়া !"

মোরগ বললে, "কঁক্-ক ? কঁক্-ক ? কিঁক্-কি ? কিঁক-কি ?"

ছাগল বলল, "মোরগমিয়া, মোরগমিয়া, বেড়ালছানার গলায় ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা পরে বেড়ালছানা ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখব। স্বপ্ন দেখার ঘণ্টা কোথায় পাওয়া যায় গো ?"

মোরগ বললে, "হায় চাচা ! ছাগল রে ছাগল, আমি কি জলে-জলে সাঁতার কাটি যে, ঘণ্টার খবর রাখব।" বলে মোরগমিয়া মুখ ফিরিয়ে নিলে। মাটিতে ঠোঁট ঠুকে, পোকা বেছে, আপনমনে পেট ভরাতে লাগল।

মোরগমিয়ার কথা শুনে ছাগলছানা ভাবল, তাহলে বোধহয় যারা জলে সাঁতার কাটে তারা বলতে পারবে ! তাই ছাগলছানা জল-ঝিলমিল ঝিলের দিকে হাঁটা দিল। ঝিলের পাড়-বরাবর এসে দেখে, একটা হাঁস সাঁতার কাটছে আর প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকছে।

ছাগলছানা হাঁক পাড়লে, "ও প্যাঁক-প্যাঁক, প্যাঁক-প্যাঁক !"

ছাগলছানার হাঁক শুনে হাঁসটা হাঁসফাঁস করে ডাঙার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলে, "কী রে ছাগলছানা ?"

ছাগল বললে, "ও প্যাঁক-প্যাঁক, হাঁস-মা, বেড়ালছানার গলায় ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা পরে বেড়ালছানা ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে। আমিও স্বপ্ন দেখব। স্বপ্ন দেখার ঘণ্টা কোথায় পাওয়া যায় গো ?"

হাঁস বললে, "হায় বোকারাম ! এই কথা ! বুদ্ধু রে বুদ্ধু, ঘণ্টা কি জলে ভাসছে যে, আমার কাছে এসেছিস ! ধরব আর গলায় পরিয়ে দেব ! ঘণ্টা যেখানে আছে, ঘণ্টা সেখানেই পাবি। সেখানে যা ! এখানে আমায় বিরক্ত করবি না ! বোকারামের বুদ্ধি কবে হবে !" বলে, হাঁসটা বিচ্ছিরি মুখ করে, ঝিলের জলে ঝিলিমিলি কাটতে কাটতে, মাঝ-বরাবর চলে গেল।

ছাগল তো হাঁসের কথা শুনে হাঁদা। কী যে বলল হাঁসটা, "ঘণ্টা যেখানে আছে, ঘণ্টা সেখানেই পাবি," মানেই বুঝল না। কেমন যেন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি ! সুতরাং আর কী হবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে, এই ঝিলের পাড়ে ! পাড় ছেড়ে সে মাঠে পা দিল। এমন গোঁ তাকে পেয়ে বসল যে, সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, ঘণ্টা না-পেলে সে ঘরেই ফিরবে না। স্বপ্ন সে দেখবেই। হাতির পিঠে সে চাপবেই। অগত্যা আকাশ-পাতাল কিছুই ভেবে না-পেয়ে সে হাঁটা দিল।

কোনখানে যাবে,
কোনখানে খাবে,
কার ঘরে শোবে,
জানে না। ভাবে না।
সে হাঁটছে।

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই সবচেয়ে ভাল...

বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্য্যাস। যা সব সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।

বোরো ক্যালেনডুলা*

অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

anjan chakraborty/Cal-74

হাঁটতে হাঁটতে ধানখেতে পড়ল।

ধানখেত পেরিয়ে যখন পাটখেতে পড়ল, তখনও সে থামল না।

কিন্তু পাটখেত পেরিয়ে আখখেতে পড়তেই, তার খিদে পেয়ে গেল।

আখের রস মিষ্টি-মিষ্টি। ঘাসের স্বাদ মিঠা-মিঠা। আখ খাবে না ঘাস খাবে ? এই কথা যেই ভাবা, অমনি দেখে কী, সামনে একটা মাটির ঘর। বাঁশ-কঞ্চির বেড়া দিয়ে চারপাশটা ঘেরা। সেই ঘেরার মধ্যে কচি-কচি কলমি শাক, বেগুন গাছ, ছোলার ঝাড়। ছোলা দেখেই ছাগলের নোলা দিয়ে জল গড়াল। ভাবল, ঘাস তো রোজ খাই, আজ ছোলা খাব। এই ভেবে সে বাঁশ-কঞ্চির বেড়ার ধারে চোখ গলিয়ে উঁকি মারলে। বাব্বা ! বেড়ার এমন বাঁধনি যে, একটু ফাঁক পর্যন্ত নেই কোথাও ! তাই, এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে আর ফাঁক-ফোঁকর খুঁজছে ! ওমা ! দ্যাখো, ছোলাগাছের কচি-কচি পাতাগুলো যেন ওর দিকে চেয়ে চোখ মটকে ঠাট্টা করছে ! মনে-মনে যা রাগান রাগছে না ছাগলছানা ! ভাবছে, থামো, একবার ভেতরে ঢুকতে যদি পাই, তো, তোদের চিবিয়ে চিবিয়ে খাই !

আরে, আরে, ও কী, ও কী ?

কী ?

এতক্ষণ নজরেই পড়েনি ! ওই তো বেড়ার গায়ে ফটক খোলা !

হ্যাঁ, তাই তো।

ছাগলছানা ছুটল ফটকের দিকে। সুট করে ফটকের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর কুচকুচ করে ছোলা চিবুতে শুরু করে দিলে। পেটটা যখন ভরে-ভরে এসেছে, তখন—

"ও বুড়ি, ও বুড়ি, বাগানে ছাগল ! গেল রে, সব গেল !" কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

ছাগলছানার পিলে গেছে শুকিয়ে ! চেয়ে দেখে, তার সামনে ঠেঙা হাতে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে ! এই দিল বুঝি কষিয়ে ! আর দাঁড়ায় ! মার ছুট ! যেই না ছুট মেরেছে, সামনে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ! ছাগলছানা সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকে টপকা মেরে দে হাওয়া !

"পালাল, পালাল !" চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি।

"পালাল, পালাল !" চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো।

বুড়ি বাঁ দিকে যায়।

ছাগলছানা ডাইনে পালায়।

বুড়ি ডাইনে হেলে।

ছাগলছানা সামনে ভাগে।

শেষে, সেই বেড়ার ভেতর বুড়ো আর বুড়ির সঙ্গে ছাগলছানার চোর-পুলিশে খেলা শুরু হয়ে গেল।

বিপদ যখন ঘোরাল হয়ে উঠল, ছাগল যখন না-পারল পালাতে, না বেড়া ডিঙুতে, তখন ছাগলছানা প্রাণের ভয়ে ঢুকে পড়ল বুড়ো-বুড়ির মাটির ঘরে। কিন্তু বুড়োও ছাড়ে না, বুড়িও হারে না। তারাও ঘরে ছুটল। তাদের দেখে ছাগলছানা তক্তাপোশে লাফ মারল। যাঃ ! পা ফসকাল ! কুঁজো ভাঙল। জল থৈ-থৈ ঘর ভাসল। জলের ওপর যেই না ছোটা, পা পিছলে দুম-ফটাস ! হাঁড়ি ভাঙল। ফেন গড়াল। বাসন ছড়াল। একেবারে নৈরেকার কাণ্ড !

তখন বুড়ো হাঁপাচ্ছে। বুড়ি কোঁকাচ্ছে। এই বয়সে কখনও পারে, একটা ছানা-ছানা ছাগলের সঙ্গে ? বুড়ো তখন বললে, "বুড়ি, বুড়ি, দে ঘরের দরজা ভেজিয়ে !"

বুড়ি তখন পড়ি-মরি করে ঘরের দরজা ঠেলতে গেছে ! আর যাবে কোথায় ? ভাতের ফেনে পা পড়েছে। চিতপটাং ! ছাগল কি আর দাঁড়ায় ? বুড়ির ঘাড়ের ওপর দিয়ে ভোঁ-কাট্টা ! ঘর পেরিয়ে, বেড়া ডিঙিয়ে দে ছুট ! তাই না দেখে, ফ্যালফেলিয়ে বুড়ো বুড়ির দিকে চায়, বুড়ি বুড়োর দিকে তাকায় !

এদিকে ছাগলছানা, সে তখনও ছুটছে। ভাবছে, বুড়ো বুঝি আসছে ! ছাগল তো ! যেমন বোকারাম, তেমনি ভিতুর একশেষ।

ছুটতে-ছুটতে সকাল কখন চলে গেল, সে জানল না। দুপুর কখন গড়িয়ে গেল, সে দেখল না। বিকেল কখন ফুরিয়ে গেল, সে বুঝল না। তারপর দিনের আলো যখন হারিয়ে গেল, তারা ফুটল আকাশে, তখন মায়ের জন্যে তার মন কেমন করে উঠল। কিন্তু মন কেমন করলে কী হবে ? এ কোথায় এসে পড়েছে ছাগলছানা ? তাই তো ! জায়গাটা চেনাও নয়, জানাও নয় ! এ যে দেখি আঁধার-ঘেরা গভীর বন ! কী হবে ? এখান থেকে বাড়ি যে কোন্‌দিকে তাও তো ঠাওর করতে পারে না ছাগলছানা ! যা! যাঃ ! হারিয়ে গেছে ছাগলছানা ! গভীর বন ছমছম, ভয়-ভয় ! তাই না- পারে কাউকে ডাকতে, না-পারে কাঁদতে। বাঘ যদি হালুম করে হাঁক

পেড়ে ঘাড়ে পড়ে ! উফ্ ! ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় !

"হুক্কা-হুয়া !" এই রে ! আচমকা একটা শেয়াল ডাকল। এবার নির্ঘাত শেয়ালের পেটে যেতে হবে ছাগলছানাকে।

"হুক্কা-হুয়া !" চমকে উঠেছে ছাগলছানা। মনে হল, ক'হাত দূরে যেন শেয়ালটা তাকে দেখে তাক করছে। আর দাঁড়ায় ! ছাগল মারল একলাফ ! ঝপাং করে এক ঝোপের মধ্যে। পড়েই, তার চক্ষু ছানাবড়া ! দেখে কী, এটা তো ঝোপ নয়, একটা মন্দির। ওই তো, শিবঠাকুর বসে আছেন ! ছাগলছানা ছুটে গেল ঠাকুরের পেছনে। লুকিয়ে পড়ল চোখের পলকে। লুকিয়ে-লুকিয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, "হে ঠাকুর, আমাকে বাঁচাও !"

"হুক্কা-হুয়া !" শেয়ালটা আবার ডাকল।

ছাগলছানা ভাবল, "এখন ডাকুক, যত পারে ডাকুক। এখন আর আমায় ধরতে হচ্ছে না। এখন তো আর আমি একা নই। শিবঠাকুর আছেন। ঠাকুরের কাছে আর শেয়ালকে আসতে হচ্ছে না !"

হ্যাঁ, সত্যি ! শেয়ালটা তো আর হাঁকছে না। তাহলে বোধহয় ভেগে পড়েছে। তাই বলে এখনই কিন্তু বেরিয়ে পড়া ঠিক না। অন্ধকারটা যাক, সকাল আসুক, তারপর। সেই ভাল।

কিন্তু এখন, এই অন্ধকারে বসে বসে শেয়ালের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মা হয়তো তাকে এখন কত খোঁজাখুঁজি করছে। ছিঃ ! কী করতে, কী হয়ে গেল ! বেড়ালছানার জন্যেই তো তাকে এমন বিপদে পড়তে হল ! কেন, একদিন ঘন্টাটা তাকে দিলে, তোর ঘন্টা কি ক্ষয়ে যেত ! ভারী একলসেঁড়ে !

রাতটা এখন কেমন করে তাড়াতাড়ি যায়, সেইটাই ভাবনা। মনে মনে ঠাকুরকে গড় করে ছাগলছানা বলল, "ঠাকুর, ঠাকুর, আজকের রাতটা যেন কালকের মতো বড় না হয়। আমি সকালবেলা মায়ের কাছে যাব।"

কতক্ষণ আর এমনি একা-একা বসে থাকা যায় ! ঘুম পাচ্ছিল ছাগলছানার, ঢুলছিল। ঘুমের আর দোষ কী ! সারাদিনই তো টো-টো করে ঘুরেছে আর ঘন্টা খুঁজেছে ! শরীর আর বয় ! কিন্তু ঘুমিয়ে পড়াও ঠিক নয়। উটকো জায়গা। কী করতে কী হয়, কেউ বলতে পারে ! উঠে পড়ল ছাগলছানা। এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখলে। তারপর শিবঠাকুরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ঘুম তাড়াতে লাগল। কিন্তু একটু পা বাড়ালেই যে একটা মস্ত সুড়ঙ্গ সে তো আর খেয়াল করেনি ছাগলছানা। তাই যেই না একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, ধপাস ! পড়া বলে পড়া ! খট-খট, ধুপ-ধাপ, ফট ! সুড়ঙ্গের মধ্যে পা ফসকে গড়াতে গড়াতে একেবারে যেন পাতালপ্রবেশ ! উঃ ! যা লাগান লেগেছে, সে আর কহতব্য নয়। আচমকা যে এমন একটা কাণ্ড হবে, ছাগলছানা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি। বেচারা খোঁড়াচ্ছে। আহা রে ! এই দ্যাখো, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার কিসে হোঁচট খেল। আবার হুমড়ি খেয়ে ঠিকরে পড়ল ! আরিব্বাস ! এগুলো কী রে ? এ তো দেখি, সোনা আর রুপোর গাদা ! বেচারা ছাগল, পড়েছে তারই ওপর ! পড়েই তো চক্ষু ছানাবড়া ! এ কী কাণ্ড ! মানুষ নেই, জন নেই, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে এতসব সোনা-রুপোর গয়না কোথা থেকে এল ! মাথা ঘুরে গেছে ছাগলছানার। ভাল করে তো দেখতে হয় ! ছাগলছানা পা বাড়াল ! এতক্ষণ খোঁড়াচ্ছিল ! এতসব সোনা-দানা দেখে, পায়ের ব্যথা-ট্যথা সব হাওয়া ! ও বাবা ! এ যে পেল্লাই সুড়ঙ্গ। ভেতরে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথের যেন শেষ নেই। তার ওপর কী অন্ধকার দেখেছ ! দরকার নেই বাবা বাহাদুরি দেখিয়ে। শেষে হিতে বিপরীত হয়ে যাক আর কি ! এখানে আর একদণ্ডও দাঁড়ানো নয় ! চলো ওপরে !

না, দাঁড়াল ছাগলছানা। তাই তো। হঠাৎ গয়নাগুলো অমন নাড়াচাড়া করছে কেন ? একটা গলার হার যেন টেনে বার করল ওই গাদার ভেতর থেকে। ওটা কি ছাগলছানা মায়ের জন্যে নেবে ? কে জানে ! কিন্তু দ্যাখো, দ্যাখো, হারটা গলায় ঝুলিয়ে ছাগলছানা কেমন ছুটতে ছুটতে সুড়ঙ্গের বাইরে আসছে !

অবিশ্যি বেশিক্ষণ ছুটতে হল না। একটু ছুটেই শিবঠাকুরকে দেখতে পেয়েছে। শিবঠাকুরের আড়ালে আবার চুপটি করে লুকিয়ে পড়ল। মনে-মনে বললে, "ঠাকুর, ঠাকুর, তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। সকালের রোদে রাস্তা খুঁজে ঘরে যাব। ঘরে গিয়ে মাকে এই হারটা দেব। মা হার পরে তোমায় পুজো দিতে আসবে।"

এমন সময় হঠাৎ যেন ছাগলছানা মালুম পেল, একটু-একটু আলো আসছে উদিক থেকে ! এ কী ব্যাপার ! এই রাতদুপুরে, অন্ধকারে, বনের ভেতর আলো কেন ! কে আসে রে বাবা ! ছাগলছানার পিলে ভয়ে একেবারে ঢিলে ! উঁকি মারল ছাগলছানা। উঁকি মারতেই ছাগলের বুকের রক্ত জল। দেখে কী, দশটা, না বারোটা লোক, মশাল জ্বেলে এই মন্দিরের দিকেই আসছে ! বলতে-বলতেই তারা মন্দিরে ঢুকে পড়ল। ঢুকে 'হর-হর বোম' বলে শিবঠাকুরের সামনে লুটোপুটি খেতে লাগল ! ছাগলের তো কম্ম শেষ ! ঠাকুরের পেছনে গুটিসুটি মেরে মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। তারপর হঠাৎ দশ-বারোটা লোক 'বোম-বোম' করতে করতে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একে-একে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়ল। ছাগলছানা স্পষ্ট দেখতে পেল, তাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। চোখগুলো রক্তজবার মতো টকটকে। কোমরে ছোরা। হাতে মশাল ! ওই ছোরা দিয়ে যদি একবার ছাগলছানার পেটে ছুড়ে মারে, তো, আর ট্যাঁ-ফুঁ করতে হবে না বাছাধনকে ! এক ঘায়েই কাত !

যাক, বেঁচে গেছে ছাগলছানা। খুব রক্ষে, লোকগুলো তাকে দেখতে পায়নি। রাতটা তার শিবঠাকুরের পেছনে বসে বসে ভালয়-ভালয় কেটে গেল। এতক্ষণ কান পেতে ছিল। একবার গাছের ফাঁকে ভোরের পাখি ডাকলেই হয় ! আর যেই না ডেকেছে পাখি, অমনি ছাগল উঁকি মেরেছে ! এখন আর বাঘও নেই, শেয়ালও ডাকছে না। এই তাল। শিবঠাকুরকে শেষবারের মতো গড় করে সে বেরিয়ে পড়ল। ঝোপের ভেতর লুকিয়ে-ছাপিয়ে হাঁটা দিলে। তারপর ঝোপ ডিঙিয়ে ছুট দিলে। সে কী ছুট ! আগুপিছু আর কিছু সে দেখল না। আর কিছু সে ভাবল না। ছুটছে বলে গলার হারটাও তার দুলছে। বাবা ! হারটা যেন আলোয় একেবারে ঝকঝক করছে। শুধু তো সোনা নয়, সোনার গায়ে নানান রঙের কত সব মণি-মুক্তা। ছাগলছানা হারের দিকে দেখছে, আর ভাবছে, না জানি কাল সারাদিন মা কত ভেবেছে, কেঁদেছে। এখন

তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে হয় !

বেশ খানিকটা ছুটে আসতেই, বন আর বন নেই। এখন সে শহরে পৌঁছে গেছে। বনের মতো শহরে তো আর বাঘ-শেয়াল নেই। কিংবা ঝোপ-জঙ্গল নেই। শহরে পাথর-ঢালা পথ আছে। গাড়ি আছে। বাড়ি আছে। রাজা আছে। রানি আছে। হাজাররকম মানুষ আছে। ছোটও আছে, বড়ও আছে। ছেলেও আছে, মেয়েও আছে।

যাঃ ! ছোট্টমতো একটি মেয়ে ছাগলছানাকে দেখতে পেয়ে গেছে। চেঁচিয়ে ডাক দিল, "মা, মা, দ্যাখো, দ্যাখো, একটা ছাগলছানা ! গলায় সোনার হার !"

মা বললে, "কই ? দেখি, দেখি !" দেখে বললে, "ওমা, তাই তো !"

মেয়ে ছুটল বাবার কাছে, "দ্যাখো, দ্যাখো, বাবা, একটা ছাগলছানা ! গলায় সোনার হার !"

বাবা বললে, "কই ? কই ? দেখি, দেখি !" দেখে বললে, "বটে, বটে, তাই তো।"

তারপর ঘরের বাইরে ছুটে এল তিনজনে। মেয়ে এল, মা এল, বাবা এল। ছানা ধরতে পথে ছুটল।

পথে এক পুতুলওলা। ফেরি করছে। মেয়ে তাকে দেখে বললে, "ও পুতুলওলা, দ্যাখো, দ্যাখো, একটা ছাগলছানা ! গলায় সোনার হার !"

"কই ? কই ? দেখি, দেখি ! তাই তো !" সেও ছুটল ছানার পেছনে। তার আর পুতুল বেচা হল না।

সামনে পড়ল ময়রার দোকান। ময়রাকে দেখে পুতুলওলা বললে, "ও মিঠাইওলা, মিঠাইওলা, দ্যাখো, দ্যাখো, একটা ছাগলছানা ! গলায় সোনার হার !"

"কই ? কই ? দেখি, দেখি ! তাই তো !" সেও ছুটল ছানার পেছনে। দোকানে তার চাবি পড়ল।

সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোতোয়াল পাহারা দিচ্ছিল। ময়রা বলল, "ও কোতোয়াল, কোতোয়াল, দ্যাখো, দ্যাখো একটা ছাগলছানা ! গলায় সোনার হার।"

"কই ? কই ? দেখি, দেখি ! তাই তো।" সেও ছুটল ছানার পেছনে। ছাগলছানা ধরা পড়ে গেল।

ছোট্ট মেয়ে বলল, "দাও, দাও, ছাগলছানা আমার।"

ছোট্ট মেয়ের বাবা বলল, "আমার।"

মা বলল, "আমার।"

পুতুল-বেচা লোক বলল, "আমার।"

মিঠাইওলা ময়রা বলল, "আমার।"

আমার, আমার, আমার। মাঝ-রাস্তায় হল্লা শুরু হয়ে গেল। হল্লা শুনে পথের মাঝে লোকে-লোকে ছয়লাপ। টানামানিতে ছাগলছানার প্রাণ যায় রে বাবা !

ঠিক এই সময়ে, রাজপথ দিয়ে চৌদোলা করে রাজা যাচ্ছিলেন এক রাজকাজে। হৈ-হল্লা দেখে হুকুম করলেন, "চৌদোলা রোখো।"

থেমে পড়ল চৌদোলা।

রাজা তাঁর দেহরক্ষীকে বললেন, "দ্যাখো তো, এত হট্টগোল কিসের !"

রক্ষী ছুটে গেল, ছুটে এল। বললে, "হুজুর, একটা ছাগলছানা। তার গলায় সোনার হার। ছানাটাকে নিয়ে জনতা কাড়াকাড়ি করছে।"

বিজ্ঞান নিয়ে গল্পের মতো বই

ছোটদের মনকে বাল্যবয়স থেকে যাতে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা যায়, তার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স একের-পর-এক বই বার করে চলেছে। পার্থসারথি চক্রবর্তী বা অরূপরতন ভট্টাচার্যর বইগুলির কথা তো তোমরা জানোই, এ-ছাড়াও রয়েছে আরও বহু বই যেখানে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীদের জীবনী আর আবিষ্কারের গল্প খুব সহজ করে ও খুব আকর্ষণীয় করে শোনানো হয়েছে। যেমন, সমরজিৎ করের 'অগ্রজ বিজ্ঞানী', অমরনাথ রায়ের 'দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী'। প্রথমটিতে এ-দেশের বিজ্ঞানীদের জীবনী ; দ্বিতীয়টিতে আড়াই হাজার বছরে স্বদেশে-বিদেশে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানীদের জীবনী। সহজে পৃথিবী পরিচয় ঘটানোর জন্য সাধনা মুখোপাধ্যায় লিখে চলেছেন 'জানা অজানা' গ্রন্থমালা। দু-খণ্ড বেরিয়েছে। একটিতে পৃথিবী ও আকাশের রহস্যের কথা, অন্যটিতে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান নদী ও শহরের কথা। 'খনি থেকে খনিজ' বা 'তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ' কিংবা 'এরোপ্লেনের জানা অজানা'—এ-সব বইয়ের বিষয়বস্তু নাম থেকেই ধরা যায়। শুধু যা বলার তা হল, প্রতিটি বইতেই বিজ্ঞান যেন গল্প-কথা। স্বাদু ও সহজবোধ্য। কৌতূহল-মেটানো ও সরস।

অশোককুমার মিত্র
এরোপ্লেনের জানা অজানা ॥ ৮·০০
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খনি থেকে খনিজ ॥ ৮·০০
ডঃ কাশীনাথ দত্ত
তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ॥ ৫·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ॥ ১২·০০
সমরজিৎ কর
অগ্রজ বিজ্ঞানী ॥ ১৫·০০
সাধনা মুখোপাধ্যায়
জানা অজানা (১) ॥ ৮·০০
জানা অজানা (২) ॥ ১৫·০০

আ ন ন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

"তাই নাকি ! কই ? কই ? দেখি, দেখি," বলে রাজাও চৌদোলা থেকে নেমে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন সর্বনাশ ! ছাগল নিয়ে জনতার মধ্যে এ যে মারদাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। রাজা বলে কথা, তাঁর সামনে মারামারি ! ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তিনি। রক্ষীকে হুকুম করলেন, "জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে ছাগলছানাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

রাজার মুখের কথা আর মুখ থেকে পড়তে হল না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সাঁই-সাঁই লাঠি ঘুরতে লাগল। যে যেদিকে পারল ছাগল-টাগল ফেলে দে লম্বা ! কাজ নেই বাবা ছাগল নিয়ে ! অমন একটা ছাগলের গলার গয়নার চেয়ে, নিজের বুকের প্রাণটির অনেক দামটি !

একটু পরেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শান্তি ফিরে এল। একজন রক্ষী এরই ফাঁকে ছাগলছানাটাকে ধরে এনে রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা তো ছানাটাকে দেখে তাজ্জব বনে গেছেন। রাজা ছাগলের মুখের দিকে তাকালেন। গলার ওপর চোখ ফেরালেন। সোনার দিকে নজর দিলেন। চমকে উঠলেন। হুকুম করলেন, "ছানাটাকে রাজবাড়িতে নিয়ে চলো !"

এই দ্যাখো ! আবার না-জানি কী বিপদ হয় ! শেষ অবধি রাজা ছাগলছানাকে বলি দিয়ে মাংস করে খেয়ে ফেলবেন না তো !

এখন তো চলো রাজবাড়ি ! ভাগ্যে যা লেখা আছে, সে তো আর কেউ খণ্ডাতে পারছে না ! সুতরাং চৌদোলায় রাজা চলেছেন, রাজার সঙ্গে ছাগলছানাও চলেছে। চলতে চলতে ছাগলছানা মাঝে-মাঝে রাজার ঠোঁটের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছে। দেখছে, তাকে দেখে রাজার নোলা দিয়ে জল গড়াচ্ছে কিনা ! না, তেমন কিছু গড়াচ্ছে বলে তার মনে হচ্ছে না।

দেখতে দেখতে চৌদোলা রাজবাড়ির সামনে এসে থামল। চৌদোলা থামতেই সিংদরজা খুলে গেল। ছাগলছানা তো আগে কখনও রাজবাড়ি দেখেনি। এখন তো দেখে থ।

রাজবাড়ি, রাজবাড়ি
ঘর-দোর সারি সারি
ঘোড়া-জোতা জুড়িগাড়ি
হাঁটা-চলা তাড়াতাড়ি
এটা-ওটা নাড়ানাড়ি
কাজ নিয়ে, কাড়াকাড়ি
সব যেন বাড়াবাড়ি

সেই রাজবাড়ির ভেতর রাজামশাই পা ফেলতেই অমনি ভ্যাঁ-পু, ভ্যাঁ-পু করে ভেঁপু বেজে উঠল। সিপাইরা অমনি ঠকাঠক্ করে সেলাম ঠুকতে লাগল। খটাখট পা ফেলে সান্ত্রিরা সব রাজার পেছনে হাঁটতে লাগল। রাজা কোনোকিছু গ্রাহ্যি না-করে ছাগলছানাকে কোলে নিয়ে গটমট করে অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

হাতি-হাতি শুঁড়-তোলা রাজার কোলে ছাগলছানাকে দেখতে পেল। প্রথমে ভড়কে গেল। তারপর ফিহিক করে হেসে ফেলল।

ঘোড়া-ঘোড়া ল্যাজ-নাড়া রাজার কোলে ছাগলছানাকে দেখতে পেল। প্রথমে হিংসে হল। তারপর চিহিক করে হেসে উঠল।

উট-উট ঢ্যাপসা-ঘাড় রাজার কোলে ছাগলছানাকে দেখতে পেল। প্রথমে রেগে কাঁই। তারপর হিহিক করে হেসে দিল।

হাসতে হাসতে হাতি বললে, "এই ছানা, আমার শুঁড়ে বসে নাচবি ?"

ছাগল ডাকলে, "ব্যা-অ্যা-অ্যা।"

রাজা ছাগলকে আদর করলেন, [illegible]ুপ।"

হাসতে হাসতে ঘোড়া বললে, "এই [illegible], আমার পিঠে বসে ছুটবি ?"

ছাগল ডাকলে, "ব্যা-অ্যা-অ্যা।"

রাজা ছাগলের গাল টিপলেন, "চুক, চুক।"

হাসতে হাসতে উট বললে, "এই ছানা, আমার ঘাড়ে বসে হাঁটবি ?"

ছাগল ডাকলে, "ব্যা-অ্যা-অ্যা।"

রাজা ছাগলের গায়ে হাত বোলালেন, বললেন, "তুত্ তুত্ !"

মন্ত্রীর ডাক পড়ল।

মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশাই, মন্ত্রীমশাই !" রাজার গলায় গোঁসা।

মন্ত্রী বললেন, "আঁজ্ঞে হুজুর, কিসের কসুর ?" মন্ত্রীর গলায় ডর।

রাজা বললেন, "রাজকোষের হার, ছাগলছানার গলায় ঝোলে কেমন করে ?"

রাজামশাইয়ের কথা শুনে, মন্ত্রীমশাই যেন ভূত দেখলেন। "তাই তো, তাই তো! এ হার তো রাজপুরুষের হার, রাজকোষের গুপ্তঘরে জমা ছিল!"

রাজা গর্জে উঠলেন, "গুপ্তঘরের গোপন-সংবাদ কে ফাঁস করেছে? ছাগলের গলায় হার কে দিয়েছে?"

অমনি খোঁজ করতে মন্ত্রী ছুটলেন রাজকোষে। এ কী সব্বনাশ! রাজকোষ যে ফাঁকা! হায়! হায়! এক টুকরো সোনা নেই, একরতি মণি নেই, মুক্তা নেই, হিরে নেই, জহর নেই! সব লুঠ! শুরু হয়ে গেল গুজব। কোথাও ফিসফাস। কোথাও জটলার জট। রাজামশাই তো তাণ্ডব শুরু করে দিলেন। কী জানি বাবা! হয়তো খেপে না যান!

ছাগল তো দেখে-শুনে ভড়কে গেছে। কিন্তু থেকে-থেকে একটা কেমন সন্দেহ তার মনের ভেতরটা খামচে খামচে ধরছে। মনে হচ্ছে, তবে কি শিবমন্দিরের সুড়ঙ্গের নীচে ওই যে অত সোনাদানা ওগুলো সব রাজবাড়ির! ওই যে শিবমন্দিরে লোকগুলোকে দেখল, ওরা বুঝি তবে ডাকাত। রাজবাড়ির রাজকোষ থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে! ছাগলছানা মনে মনে ভাবলে, "কী করা যায় এখন!"

এদিকে রাজার ধাতানি খেয়ে মন্ত্রী চেঁচান, "কী করি! কী করি!"

রাজা হাঁকেন, "যত সব অকম্মের ধাড়ি।"

মন্ত্রীমশাই চমকে বলেন, "ছাগলছানাকে কয়েদে পাঠাই?"

রাজা বললেন, "বুদ্ধির ঢেঁকি।"

"তবে দ্বীপান্তরে দিই!"

রাজা বললেন, "আপনার মুণ্ডু।"

"তাহলে শূলে চাপাই!"

"না!" রাজা ভীষণ চিৎকার করে উঠলেন। গলায় যেন বাজ পড়ল। সেই চিৎকার শুনে মন্ত্রীমশাই তো ভয়ে একেবারে থরহরি কম্পমান! আর ছাগলছানাটাও এমন আঁতকে উঠেছে যে, সে রাজামশাইয়ের হাত ছিটকে মার দৌড়!

মন্ত্রী থতমত খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হুজুর, হুজুর, পালাল।"

রাজা ধমকে বললেন, "যেতে দিন।" বলে হাঁক পাড়লেন, "সেপাই!'

সেপাই ছুটে, সেলাম ঠুকে কাঁপতে লাগল।

রাজা হুকুম দিলেন, "আমার ঘোড়া বার করো। একশোজন সেপাই আমার সঙ্গে এসো।"

ছাগলছানা ততক্ষণে সিংদরজা পেরিয়ে রাজপথে ছুট দিয়েছে। রাজপথে নেমে, যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে সে ছুট মারল। ঘোড়ার পিঠে রাজা, তার পেছনে একশো সেপাই ছাগলছানার পিছু নিল।

তারপর, শহর গেল পেরিয়ে,
নগরও যায় ছাড়িয়ে,
গেরাম গেল হারিয়ে
বনের ভেতর ছাগলছানা পা দিল তার বাড়িয়ে।

ওমা! এ যে সেই বন! ঠিক তো! কেমন চিনে চিনে এসেছে দ্যাখো! বনের ভেতর শিবমন্দিরের চূড়াটা যেই দেখতে পেল, অমনি ছাগলছানা থমকে দাঁড়াল। রাজা অমনি চমকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। একশোজন সেপাই এদিক-ওদিক ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিল। ছাগলছানা নিঃসাড়ে ঢুকে গেল শিবমন্দিরে। ছাগলছানার পেছনে রাজাও ঢুকে পড়লেন মন্দিরের ভেতরে।

মন্দিরের সেই সুড়ঙ্গের ভেতর ছাগলছানা ছুটে নামল।

রাজাও পিছু নিলেন।

তারপর রাজা থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাজার চোখ ঝলসে গেল। সেই সুড়ঙ্গের ভেতর চারিদিকে সোনা আর মানিক, মণি আর মুক্তা। রাজার তো চক্ষু কপালে!

রাজা আর দাঁড়ালেন না সেখানে। সোনাদানা যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে রইল। ছাগলছানাকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একশো সেনার সঙ্গে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের ভাঙা দরজার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখলেন। অনেকক্ষণ।

তখন গভীর রাত। বনের ভেতর গভীর রাতের অন্ধকার যে কী ভয়ঙ্কর, যে না দেখেছে, সে জানবে কেমন করে! হঠাৎ হল কী, সেই অন্ধকারে, গাছের ফাঁকে আলোর স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠল। এগিয়ে আসছে সেই আলোর ঢেউ। এঁকেবেঁকে। আর একটু দৃষ্টি স্থির রাখতেই বোঝা গেল, এ যেন মশালের আলো। এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকেই। একটু পরেই নজরে পড়ল, দশ-বারোটা লোক, লুঠের বোঝা কাঁধে ফেলে, মশাল জ্বেলে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাজা সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালেন।

একশো সেপাই তৈয়ার হল।

রাজা আদেশের নিশান দিলেন।

একশো সেপাই ঝোপ ডিঙিয়ে এগিয়ে এল।

রাজা হঠাৎ গর্জে উঠলেন, "ঝাঁপিয়ে পড়ো!"

অমনি তরোয়াল বেজে উঠল। সুড়ঙ্গের ভেতরটা গমগম করে কেঁপে ইঠল। ডাকাতের হাতের মশাল হাত থেকে ছিটকে পড়ল। একশোজন সেপাই দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে ডাকাতের দল দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে শিকল, পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল সেপাইরা। বন্দী করে রাজবাড়িতে নিয়ে চলল। আর নিয়ে চলল, সেই সুড়ঙ্গে লুকানো ছিল যত সোনা-চাঁদি সব।

রাজার হুকমে আজ সারা রাজ্যে ঢেঁড়া পড়ল। রাজবাড়ির লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে গেল, "রাজার হুকুমে আজ বিশেষ দরবার বসছে। সেই দরবারে সকলকে উপস্থিত থাকতে রাজামশাই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সকলের জন্য দরবার আজ উন্মুক্ত।"

দেখতে দেখতে লোকে-লোকে উপচে গেল দরবার-হল। ঠিক সময়ে সিংদরজায় মস্ত ঘণ্টা বেজে উঠতেই, রাজামশাই পাত্র-মিত্র, সভাসদ সঙ্গে নিয়ে দরবারে হাজির হলেন। আজ তিনি একা নন। তাঁর পাশে বসল, তাঁর ছোট্ট মেয়ে রাজকন্যা! সত্যি, দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর দেখতে! রাজকন্যা তো নয়, যেন স্বর্গের অপ্সরা!

রাজা ইশারা করলেন। দরবারে যেটুকু গুনগুনানি শোনা যাচ্ছিল নিমেষে নিশ্চুপ হয়ে গেল। যেন নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। শোনা গেল রাজামশাইয়ের গম্ভীর গলার স্বর। তিনি বললেন, "প্রিয় দেশবাসী, আমি আজ এক বিশেষ কারণে

আপনাদের সকলকে দরবারে আমন্ত্রণ করেছি। আপনারা এই মুহূর্তে একটি খবর শুনলে হয়তো শিউরে উঠবেন। শিউরে উঠবেন এই কথা শুনলে যে, আমাদের রাজকোষে যত সোনাদানা ছিল, আমাদের সকলের অজান্তে একদল ডাকাত সেগুলি চুরি করে নিয়ে যায়! কিন্তু আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, আমরা সেগুলি সবই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আর এই উদ্ধারের কাজে আমাদের যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, তাকে আজ আপনাদের সকলের সামনে সম্মান জানাব বলেই, আপনাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি আমি। এক্ষুনি তাকে আপনাদের সামনে হাজির করা হচ্ছে।" বলে, রাজা নিজেই হাতে তালি বাজিয়ে ইশারা করলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে একজন সেপাই ছাগলছানাকে কোলে নিয়ে দরবারে হাজির হল।

ছাগলছানা দেখে তো সবাই হাঁ!

রাজা আবার বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাগলছানা দেখে আপনাদের অবাক হবার কিছু নেই! আপনারা শুনে রাখুন, এই ছাগলছানাকেই আমরা সম্মান জানাব বলে এই দরবার ডেকেছি। মানুষ যা পারেনি, এই ছাগলছানা তাই পেরেছে। চোরাই মালের হদিস তো সে দিয়েছেই, তার ওপরে ডাকাতগুলোকে ধরতেও সাহায্য করেছে। তাই আমি ঠিক করেছি, ছানার গলায় একটি সোনার ঘণ্টা পরিয়ে দিয়ে তাকে আমরা পুরস্কৃত করব। আপনারা কী বলেন?"

অমনি দরবারসুদ্ধু লোক উল্লাস করে উঠল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

"আর সেই সোনার ঘণ্টা ছানার গলায় পরিয়ে দেবে আমার মেয়ে, রাজকন্যা। আপনারা কী বলেন?"

"খুব ভাল, খুব ভাল।" দরবারে আনন্দের ঢেউ।

সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী এল। তার হাতে রুপার থালা। রুপার থালায় একটি সোনার ঘণ্টা। আলোয় তার জৌলুস ঠিকরে পড়ছে। রাজকন্যা রুপার থালা থেকে সোনার ঘণ্টাটি হাতে নিল। এগিয়ে গেল ছানার দিকে। ছাগলছানার গলাটি জড়িয়ে ধরল। আদর করল। গলায় ঘণ্টাটি পরিয়ে দিল। অমনি ঘণ্টা বেজে উঠল, টুং-টাং। দরবার-ভর্তি লোক খুশিতে উছলে হাতে-হাতে তালি বাজিয়ে নেচে উঠল! দেখেশুনে ছাগলছানা তো একদম হাঁদারাম!

গলায় ঘণ্টাটি পরিয়ে দিয়েই রাজকন্যা ছুটে গেল বাবার কাছে। গলা জড়িয়ে কানে-কানে কী বলল যেন। রাজা শুনলেন, ঘাড় নাড়লেন, মুচকি হাসলেন। তারপর সেপাইকে হুকুম করলেন, "ছাগলছানাকে ছেড়ে দাও! ও মায়ের কাছে যাবে। মায়ের মতো সুখ আর কোথা সে পাবে?"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে ছাগলছানাকে ছেড়ে দেওয়া হল। মাটিতে পড়েই ছাগলছানা ছুটতে গেল। ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। রাজকন্যার মুখের দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখল ছাগলছানা। হাসি-হাসি মুখে রাজকন্যা হাত বাড়াল। ছুটে এসে ওর গালে একটা চুমু খেল। নেচে উঠল ছাগলছানা। তারপর ছোটা দিল খুশিতে নাচতে নাচতে। সিংহাসন ছেড়ে ছুটে এলেন রাজা। রাজার হাত ধরে ছুটে এল রাজকন্যা। ছুটে এল অগুনতি মানুষ। দেখতে লাগল এক বাহাদুর ছাগলছানা মায়ের কাছে ছুটে চলেছে আর তার গলায় সোনার ঘণ্টা বাজছে টুং-টাং, টুং-টাং!

ছুটতে ছুটতে সবার চোখের আড়ালে চলে গেল ছাগলছানা। দরবারের অগুনতি মানুষ ছাগলছানার কথা ভাবতে ভাবতে চলে গেল যে-যার ঘরে।

অনেকক্ষণ ছুটেছিল ছাগলছানা। ছুটতে-ছুটতে ঘণ্টার শব্দ যতই বেজে বেজে উঠছিল, আকাশটা ততই যেন ঝলমলিয়ে উঠছে। বাতাসটা ততই যেন ঝুরঝুরু হাসছে। আর ফুল-বাগিচার মৌমাছিরা ততই যেন গুন-গুন-গুন গাচ্ছে।

আর সেই বেড়ালছানাটা সোনার ঘণ্টার শব্দ শুনে ছুটে এসেছিল ছাগলছানার কাছে। জিজ্ঞেস করেছিল, "ছাগলছানা, ছাগলছানা, এমন সোনার ঘণ্টা কে দিল রে তোকে? কী সুন্দর!"

ছাগলছানা বলল না কিছু। হাসল আর মুখ ফিরিয়ে মায়ের কাছে চলে গেল।

মা তো ছানাকে দেখে হাসবে, না কাঁদবে, ছুটবে, না নাচবে! ছানাকে জড়িয়ে ধরে কী আদর, আর কী আনন্দ! মা বললে, "ছানা, ছানা, দুধ খাবি আয়! আহা রে, বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে! চোখের কোলে কালি পড়েছে। আমার অমন গাবুস-গাবুস ছানা, এখন, একেবারে আধখানা!" বলে, মা ছানাকে দুধ খাওয়ালে। ছানা পেট ভরে দুধ খেলে।

তারপর সেদিন রাত এসেছিল। ছাগলছানার চোখ-জুড়িয়ে ঘুম এসেছিল। সোনার ঘণ্টা গলায় পরে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর সে স্বপ্ন দেখেছিল। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছিল, সেই মিষ্টি-মিষ্টি রাজকন্যার। রাজকন্যা, শুধু রাজকন্যা! আঃ!

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে সদাশিব চোখ তুলে দেখল ।

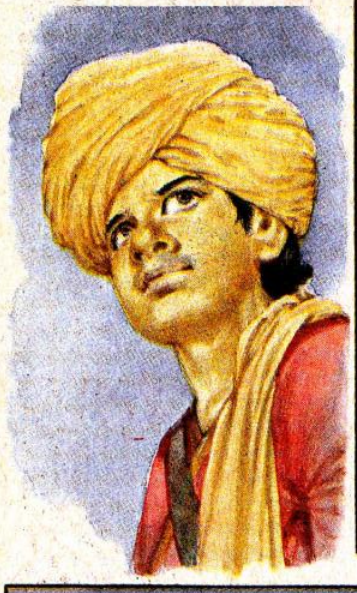

চাকন দুর্গের নিস্তব্ধ ধূসর মূর্তি শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ।

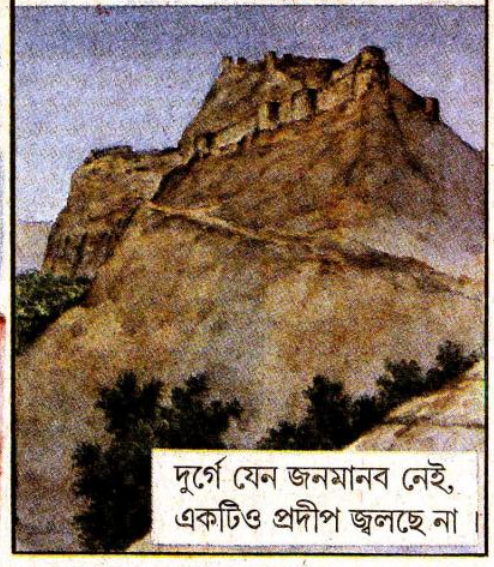

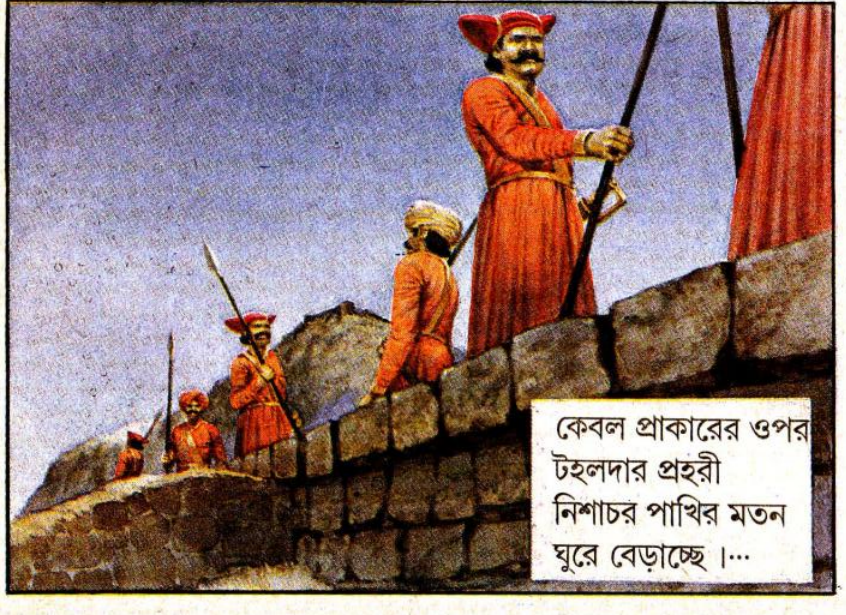

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সদাশিবের মাথায় আস্তে-আস্তে একটা বুদ্ধি গজাতে লাগল...

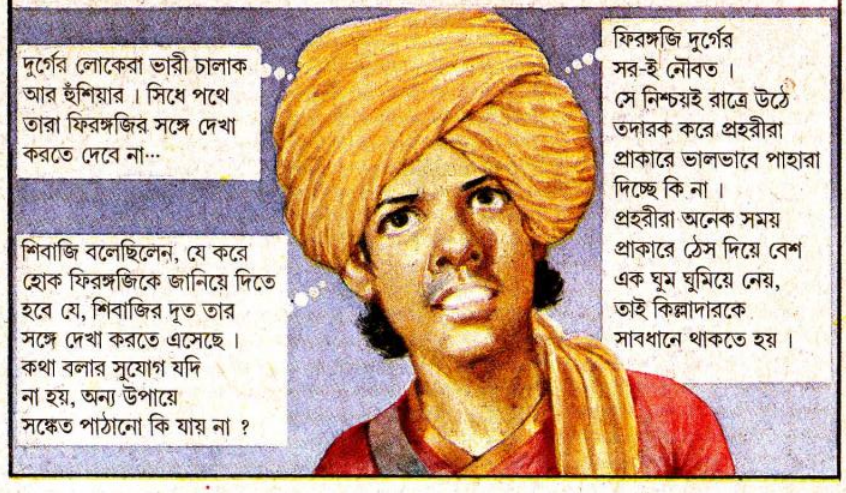

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব ছৈ ছৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

ছবি এঁকেছে **অজপা গুপ্ত** (বয়স ৫)

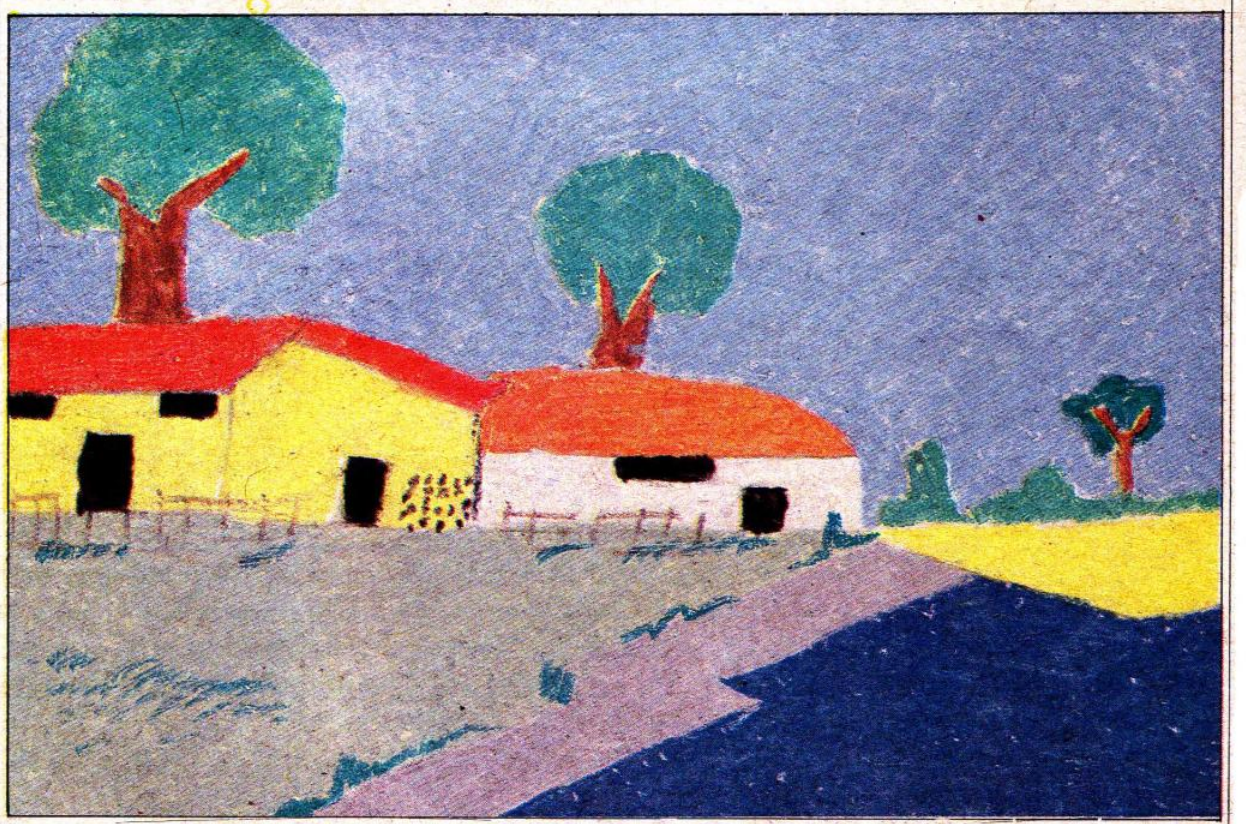

ছবি এঁকেছে **উর্বশী ভট্টাচার্য** (বয়স ১০)

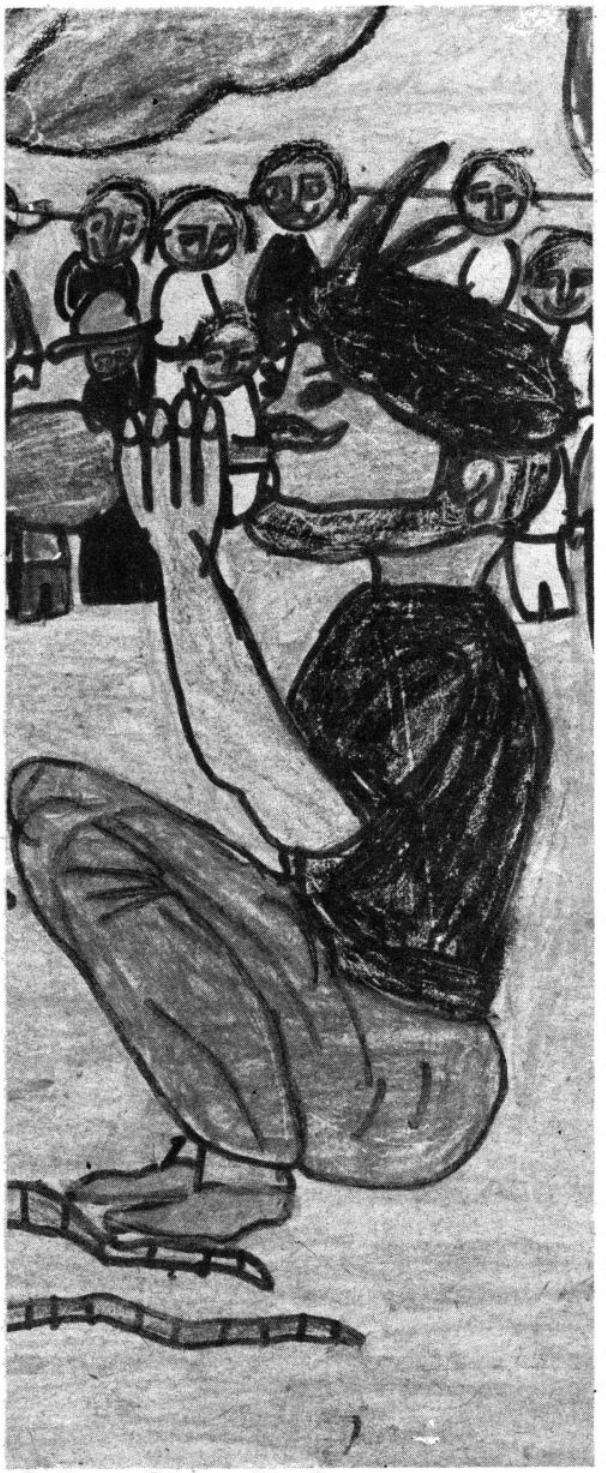

ছবি এঁকেছে **দীপায়ন ভট্টাচার্য** (বয়স ৮)

নামখানা

নামখানা তার নামখানা
মাছের জন্য সবাই সেথায় দেয় হানা
সেথায় যেতে নেইকো মানা
সুন্দরবনের একটি থানা
নামখানা তার নামখানা

নীলাঞ্জনা দাস (বয়স ১১)

আমার ইচ্ছা

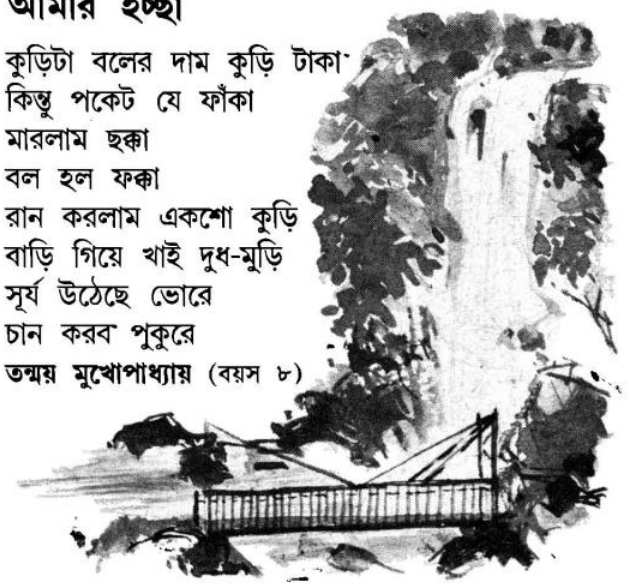

কুড়িটা বলের দাম কুড়ি টাকা
কিন্তু পকেট যে ফাঁকা
মারলাম ছক্কা
বল হল ফক্কা
রান করলাম একশো কুড়ি
বাড়ি গিয়ে খাই দুধ-মুড়ি
সূর্য উঠেছে ভোরে
চান করব পুকুরে

তন্ময় মুখোপাধ্যায় (বয়স ৮)

এলিফেণ্টা ফল্‌সে কিছুক্ষণ

নির্জন পাহাড়ি শহর শিলংয়ে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কাটল। শিলংয়ে থাকার সময় ঠিক করলাম, ওখান থেকে সাত মাইল দূরে এলিফেণ্টা ফল্‌সে বেড়াতে যাব।

একদিন সকালে উঠে যাত্রা করলাম একটা ছোট বাসে করে। আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে ছুটে চলল বাস। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। পাথর-বেছানো রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। তখন সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। দুদিকে পাইন গাছের বন। গাছগুলি কুয়াশার আবরণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি।

যত এগোতে লাগলাম জলপ্রপাতের শব্দ তত কানে আসতে লাগল। রাস্তাটা সোজা নীচের দিকে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে। একটা ছোট সেতু অতিক্রম করে আমরা আরও নীচে নামলাম। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা উঁচু পাথর থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে পড়ছে এলিফেণ্টা ফল্‌স। আমরা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নীচে নেমে গেলাম।

চারিদিকে জঙ্গল এবং স্থানটা নির্জন। মাটিতে জল পড়ে স্থানটা একটা ছোট পুকুরের আকার ধারণ করেছে। সেই জলে হাত দিয়ে দেখলাম জলটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। বাবা কয়েকটা ছবি তুললেন। তারপর যাবার সময় হয়ে এল। আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ চেষ্টা করলাম জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে। একসময় পাইনের বন অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম বাসস্টপে।

তারপর কলকাতায় চলে এসেছি, কিন্তু এলিফেণ্টা ফল্‌সের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

রঙ্গন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

মারাঠি গল্প

মূর্তি-রহস্য

মালতী দণ্ডেকর

জার্মানির গ্রিম-ভাইদের লেখা গল্প তোমরা পড়েছ। ডেনমার্কের হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেনের গল্প তোমরা পড়েছ। সেইসঙ্গে ইংরেজ লেখক আর. এল. স্টিভেনসনের কিছু লেখাও পড়েছ নিশ্চয়। অথচ, এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য ভাষায় রচিত শিশুসাহিত্যের বিশেষ খোঁজখবর তোমরা রাখো না। এখন থেকে তাই অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা শিশুসাহিত্যের কিছু-কিছু অনুবাদ আমরা 'আনন্দমেলা'য় প্রকাশ করব। আপাতত প্রকাশিত হবে গল্পের অনুবাদ। ফি মাসে এই রকমের অন্তত একটি গল্প তোমরা পাবে। এ-মাসে একটি মারাঠি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করা হল।

বুড়ো বটগাছটি ছোট্ট দেওয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভিতরে উঁকি মারছিল। নিশুতি রাত। সারা পৃথিবী অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু দৌলুর চোখে ঘুম নেই। আর ক'দিন বাদেই কৃষ্ণ-উৎসব, দৌলু তাই রাত জেগে উঠোনে বসে আপনমনে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি তৈরির কাজ করে যাচ্ছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীরঙ্গপুরের নামী-দামি লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর-সুন্দর মূর্তি দিয়ে বাড়ি সাজান। আর সেই-মূর্তিসজ্জা দেখবার জন্য বাড়িতে-বাড়িতে হৈচৈ পড়ে যায়, গভীর রাত পর্যন্ত লোকজনের আনাগোনায় চারদিক গমগম করতে থাকে। ভারী চমৎকার সেই দৃশ্য—ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে যায় দৌলু।

দৌলুর বাবা ছিলেন একজন নামকরা মৃৎশিল্পী—এ-কথা দৌলু তার মায়ের মুখ থেকেই শুনেছে। তাঁর তৈরি মূর্তির কদরই ছিল আলাদা। কৃষ্ণ-উৎসবের জন্য, দাম যতই চড়া হোক, মূর্তি তৈরি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যেত। মৃৎশিল্পী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

কিন্তু তিনি খুব বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই দৌলুদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই। সবচেয়ে কষ্ট হয় মায়ের কথা ভেবে। লোকের বাড়ি কাজ করে মা সংসার চালান। অভাব অনটনে লেখাপড়াও বেশি শিখতে পারেনি দৌলু, কোনোরকমে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। তবে লেখাপড়া কম শিখলে কী হবে, তার মনের মধ্যে যে সহজাত ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তা যাবে কোথায়। আস্তে আস্তে সেই লুকনো ক্ষমতার বিকাশ হতে লাগল। দৌলু তার বাবার মতো নানারকম মাটির খেলনা তৈরি করতে শুরু করে। সেইসব খেলনার কী সুন্দর রঙ, কী অপূর্ব তাদের গড়ন! দেখে চোখ ফেরানো যায় না। দৌলুর গড়া বাহারি খেলনা দেখে লোকের তাক লেগে যায়।

মা দৌলুর বাবার তৈরি রাধা-কৃষ্ণের একটি যুগল-মূর্তি খুব সন্তর্পণে বাক্সের মধ্যে তুলে রেখেছিলেন। সেই মূর্তিটি দৌলুকে দেখিয়ে তিনি একদিন বললেন, "দ্যাখো দৌলু, রাধা-কৃষ্ণের এই চমৎকার মূর্তিটি তোমার বাবা তৈরি

করেছেন। মাটির মূর্তি, কিন্তু এত জীবন্ত যে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি কথা বলবে। কখনও যদি এরকম মূর্তি তৈরি করতে পারো তো জীবন সার্থক।"

ব্যস্, মায়ের কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে দৌলুর মনে গেঁথে যায়। সে-ও বাবার মতো মূর্তি বানাবে, রাধা-কৃষ্ণের জীবন্ত মূর্তি। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মূর্তি বানাবার নেশা পেয়ে বসল দৌলুকে। দিন নেই, রাত নেই—খড়, মাটি, রঙ, তুলি, এইসব নিয়ে সবসময় তন্ময় হয়ে থাকে দৌলু। ছেলের এই কাণ্ড দেখে মা চেঁচামেচি করেন, রাগ করেন, মাঝে-মাঝে গালমন্দও করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যেদিন মা খুব বেশি বিরক্ত হন কিংবা রাগারাগি করেন, সেদিন দৌলুর আর কিছু করার থাকে না। লক্ষ্মীছেলের মতো মূর্তি বানাবার সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে ফেলে। মূর্তিগুলো ঘরের এককোণে লুকিয়ে রেখে ঘুমোতে যায়।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে সবে শুয়েছে দৌলু। হঠাৎ বাইরে একটা 'ধুপ' করে শব্দ। মুহূর্তে তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়। জানালার সামনে এসে বাইরে উঁকি মেরে দেখে, একটি ছায়ামূর্তি আস্তে-আস্তে দৌলুদের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে।

নিকষ কালো রাত। বাইরের কোনো কিছুই ঠিক-ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পলকহীন চোখে দৌলু তাকিয়ে আছে, বুক ঢিপ-ঢিপ করছে তার। কোথায় যাচ্ছে এই ছায়ামূর্তি। হঠাৎ ফশ্ করে একটি দেশলাই-কাঠি জ্বলে ওঠে। সেই অল্প আলোয় দৌলু দেখে—বহু যত্নে আর পরিশ্রমে-গড়া তার সেই মাটির মূর্তিগুলোর সামনে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা। সে সজোরে একটা মূর্তির পেটে ঘুসি মারে। আর ঠিক তক্ষুনি দেশলাই-কাঠিটা নিবে যায়। দৌলু নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখে, সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

এইসময় ধারেকাছেই কোথাও পুলিশের বাঁশি বেজে ওঠে। কে যেন দুদ্দাড় শব্দে উঠোনের সামনে দিয়ে দৌড়ে পালায়। লাফ দিয়ে দেওয়াল টপকায়।

কিছুক্ষণ বাদে দৌলু হ্যারিকেন নিয়ে বাড়ির বাইরে আসে। কিন্তু, এ কী! সব দেখে হতবাক হয়ে যায় দৌলু। তার তৈরি রাধাকৃষ্ণের অমন বাহারি মূর্তিটার গায়ে একটা মস্ত ক্ষতচিহ্ন। কেউ যেন নিপুণহাতে ছুরির ঘায়ে মূর্তির শরীর খুবলে দিয়েছে। দৌলুর সঙ্গে তো কারুর কোনো শত্রুতা নেই। আর এই নির্বাক মূর্তিটিই বা কার কী ক্ষতি করেছে। নিশ্চয়ই কোনো পাগলের কাণ্ড এ-সব। দুঃখে ক্ষোভে দৌলুর চোখ জলে ভরে ওঠে। এই ভাঙা মূর্তি কার কাজে লাগবে! পয়সা দিয়ে কেউ এই মূর্তি কিনবে না। তার এতদিনের পরিশ্রম, কষ্ট ব্যর্থ হয়ে গেল।

দৌলু আবার নতুন উদ্যমে মূর্তি তৈরি করতে শুরু করে দেয়। রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিগুলো যেন এবারে আরও সজীব আর সুন্দর হয়ে ওঠে। বিক্রিও হয়ে যায় চড়া দামে। দৌলুর মনে আনন্দ ধরে না।

মহা সমারোহে শ্রীরঙ্গপুরে কৃষ্ণ-উৎসব শুরু হল। বাড়িতে-বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। কোনো-কোনো বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি দেখে লোকে চোখ ফেরাতে পারে না। তারা বলাবলি করে, কার তৈরি এইসব মূর্তি। মূর্তিগুলো যে একেবারে অন্যরকম! মাটির মূর্তিও এমন সুন্দর আর জীবন্ত হয়! আশ্চর্য।

কেউ বলে, "আরে, এ তো কানুর ছেলে দৌলুর কাজ! দারুণ হাত ছেলেটার। বাপকা বেটা!"

দৌলুর মূর্তি দেখে মানুষ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দৌলু ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শোনে আর আনন্দে টগবগ করে ওঠে।

সেদিন সকালবেলা হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল, দয়ারাম শেঠের ঠাকুরঘরে রাখা রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিকে কে খুবলে দিয়ে গেছে। সারা গ্রাম উত্তেজনায় ফুঁসে উঠল। কার এত স্পর্ধা! বাড়িতে পাহারাদার ছিল, তার নজর এড়িয়ে কোন্ সাহসে একটা লোক ঠাকুরঘরে ঢুকে এই কাণ্ড করে গেল! এ তো রীতিমত অঘটন।

পরের দিন গ্রামে আবার হৈচৈ। মোতিচাঁদের বাড়িতে এই একই কাণ্ড। অপরাধী নিঃশব্দে কখন ঘরে ঢুকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে ভেঙে দিয়ে শটকে পড়েছে।

তার পরের দিন আবার দুর্ঘটনা। নন্দলাল সরাফের বাড়িতে চিৎকার-চেচামেচি। ঠাকুরঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাধাকৃষ্ণের অনুপম যুগল-মূর্তি। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মূর্তির হাত-পা, শরীরের নানা অংশ। ভয়ে ভাবনায় নন্দলালের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এই ক'দিন আগেই তার দোকান থেকে দেড় লক্ষ টাকার হিরে-জহরত চুরি হয়ে গেছে। সেই ক্ষত শুকোতে-না-শুকোতে আবার এই অঘটন। কে জানে কপালে কী আছে!

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, শুধু দৌলুর তৈরি মূর্তিগুলোরই এই দশা হয়েছে, আর কারুর তৈরি মূর্তিতে অপরাধীর নখের আঁচড়টিও লাগেনি।

এইসব কাণ্ড দেখে নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, এটা দৌলুরই কাজ। কেউ বলল, ছেলেটা যা-তা, একেবারে অপয়া। কেউ বলল, ওর তৈরি মূর্তির মাটিটাই বাজে। কেউ বলল, ওকে ডেকে দু'চার ঘা দিলেই আসল কথা জানা যাবে।

কথাগুলো দৌলুর কানে যেতে সে দুঃখে ক্ষোভে কেঁদে ফেলে। এ কী শুনছে সে! মা সান্ত্বনা দেন, কান্নাকাটি করে কী লাভ? সব ঠিক হয়ে যাবে। মায়ের কথায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় দৌলু। চোখের জল মুছে ফেলে। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে সে, হেরে গেলে চলবে না। এর বিহিত করতেই হবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই দৌলু কয়েক দিনের খবরের কাগজ যোগাড় করে ফেলে। খুব মন দিয়ে কাগজগুলো পড়ে। কিছুদিন আগে নন্দলাল সরাফের দোকানে হিরে-চুরির ঘটনার ছোট-বড় খবর ছিল কাগজগুলোতে। চুরির কোনো কিনারা না-হওয়ায় দোষ চাপানো হয়েছিল পুলিশের ঘাড়ে। এইসব খবর পড়তে-পড়তে দৌলুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়।

মূর্তি-রহস্য নিয়ে নানারকম ভাবছিল দৌলু। মা এসে বললেন, "বাবা দৌলু, ঠাকুর বেণীমাধবের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল। ওঁদের রাধাকৃষ্ণ নিয়ে ওঁরা খুব ভয় পাচ্ছেন। যদি সেই অপরাধীর হাত ওঁদের মূর্তির গায়েও লাগে, এই ভয়ে ওঁরা আরও একটা যুগল-মূর্তি চাইছেন। তুই তোর সেই ভাঙা মূর্তিটাকে ঠিকঠাক করে রাখিস বাবা, কাল সকালে ওঁদের

লোক এসে নিয়ে যাবে।"

'ভাঙা মূর্তি!' দৌলুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। যে-রাত্রে নন্দলাল সরাফের দোকানে হিরে-জহরত চুরি হয়েছিল, সেই রাত্রেই একটি ছায়ামূর্তি বটগাছ থেকে তাদের উঠোনের সামনে ধুপ করে লাফিয়ে পড়েছিল....আর লুকিয়ে-রাখা নির্দোষ মূর্তির শরীর থেকে বেশ কিছুটা মাটি খুবলে নিয়েছিল....কাঁচা মাটির মূর্তি তখনও ভাল করে শুকোয়নি। চিন্তার জট আস্তে আস্তে খুলতে থাকে, দৌলুর কাছে পুরো ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার।

দৌলু দৌড়ে ঘরে ঢুকে রাধাকৃষ্ণের সেই ভাঙা মূর্তিটা ভাল করে দেখে আসে। তারপর মূর্তিটাকে সন্তর্পণে একটা বাক্সের মধ্যে ভরে থানার দিকে দৌড়োয়।

পরের দিন কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হল : হিরে-চোর হাতেনাতে ধরা পড়েছে। দৌলুর বুদ্ধি, সাহস এবং সতর্কতার জন্যই যে অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয়েছে—পুলিশ নিজেই একথা খবরের কাগজকে জানিয়েছে। ঘটনাটা এইরকম :

ঠাকুর বেণীমাধবের বাড়ি থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি চুরি করে অপরাধী একটি জলসার ভিড়ে ঢুকে পড়ে। পুলিশ আগে থেকেই ওত পেতে ছিল। অপরাধী পালাবার সুযোগ খুঁজছে বুঝতে পেরে পুলিশ তাকে চেপে ধরে।

আসলে সেদিন গভীর রাতে নন্দলাল সরাফের দোকান থেকে হিরে চুরি করে অপরাধী গা-ঢাকা দেয় এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দৌলুদের বাড়ির উঠোনে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরেই সে বিষম ফ্যাসাদে পড়ে যায়। এতগুলি হিরের গয়না কোথায় লুকিয়ে রাখবে সে! শেষপর্যন্ত লোকটি একটা উপায় বার করে—দৌলুর রাধাকৃষ্ণের মূর্তির গায়ে একটা মস্ত গর্ত তৈরি করে হিরেগুলো লুকিয়ে ফেলে। পরে যখন দৌলুর তৈরি মূর্তিগুলো বিক্রি হচ্ছিল তখন চোর মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। কোন্ মূর্তির শরীর খুবলে সে হিরে রেখেছিল, বুঝতে পারে না। তাই সে একটার পর একটা মূর্তি ভেঙে হিরের খোঁজ করেছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, যে-মূর্তির শরীরে হিরে লুকোনো ছিল, দৌলু সেই মূর্তিটা বিক্রিই করেনি।

পরে পরীক্ষা করে সেই মূর্তিটার গায়ে চোরের হাতের ছাপও পাওয়া যায়। মূর্তিটা তো তখনও ভাল করে শুকোয়নি, কাজেই তার হাতের ছাপও ছিল পরিষ্কার। ফলে রহস্যভেদ করতে অসুবিধে হল না।

চোর ধরা পড়ল। হিরে পাওয়া গেল। দৌলুদের বাড়িতে পুলিশ-অফিসার এলেন। এলেন নন্দলালও। কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগল, দৌলুদের বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসে গেল। নন্দলাল সরাফ দৌলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "দৌলু, তুমি যাতে ভবিষ্যতে একজন বড় শিল্পী হয়ে ওঠো, আমি তার সব ব্যবস্থা করব। মূর্তিকলার সবরকম কাজ শেখার সুযোগ তোমাকে দেব আমি। তাতে খরচপত্র যা হবে সব আমার।"

দৌলুর মায়ের চোখ আনন্দে চিক্‌চিক্ করে উঠল। সবাই বলতে লাগল, "শাবাশ দৌলু!"

অনুবাদ : শৈলী ভার্মা

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্ল্যাশ গর্ডন

সান-ফ্রানসিসকোতে এখন সূর্য উঠছে !
আর কি সেখানে ফেরা যাবে ?
ফিরবার চেষ্টা করতে হবে ।
দেখি মিংয়ের জাদু-আংটিতে কাজ হয় কি না ।
ও-আংটি অলক্ষুনে ফ্ল্যাশ । আমার বাবাকে তো আমি জানি !
তোমরা বরং মঙ্গোতেই থেকে যাও ।
কী, এখানেই থেকে যেতে চাও ?
এখনকার মতো থাকছি । কিন্তু পৃথিবীতে ফিরবই ।
(সমাপ্ত)

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : জন ওপ্‌নশয়ের কাকার কাছে রহস্যময় চিঠি আসে। খামের ভিতর থেকে ঝরে পড়ে কমলালেবুর পাঁচটি বীজ। কাকার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু হয় ওপ্‌নশয়ের বাবারও। তারপর চিঠি পায় জন ওপ্‌নশ নিজেই। খামের ভিতরে এবারেও সেই পাঁচটি বীজ। শার্লক হোম্‌সের সিদ্ধান্ত, ব্যাপারটার পিছনে গুপ্ত সমিতি কু ক্লুক্স ক্লানের হাত রয়েছে। তারপর ···

॥ ৫ ॥

পরের দিন সকালে উঠে দেখি, আকাশ একদম পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। আগের দিন যে প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি হয়ে গেছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। হোম্‌স দেখলুম আমার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মুখ ধুয়ে আমি যখন চা খেতে গেলুম, তখন তার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে দেখে হোম্‌স বললে, "আজ তোমার জন্যে অপেক্ষা না করেই চা খেতে আরম্ভ করেছি বলে আশা করি কিছু মনে করোনি। আসল কথা কী জানো, ওপ্‌নশ ছোকরার কেসটা নিয়ে আজ সারাটা দিনই হয়তো বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হবে।"

"ওপ্‌নশকে বাঁচাবার জন্যে কী ব্যবস্থা নেবে বলে ভাবছ ?"

"সেটা অনেকখানি নির্ভর করবে আমার তদন্তের ফলাফলের ওপর। হয়তো আমাকে হর্শ্যামে যেতে হতে পারে।"

"সে কী ! তুমি কি প্রথমেই হর্শ্যামে যাবে না ?"

"না। আমার কাজ শুরু হবে এই লণ্ডন শহরেই।··· হাঁক দাও, এখুনি তোমার চা এসে পড়বে।"

চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি সকালের খবরের কাগজটা তুলে নিলুম। কাগজটা তখনও খোলা হয়নি। কাগজটা খুলে চোখ বোলাতেই খবরটা আমার নজরে পড়ল। খবরের শিরোনামটা পড়তেই একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "হোম্‌স, তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ !"

"ওঃ !" হাতের চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে হোম্‌স বললে, "এই আশঙ্কাটাই আমি করেছিলুম। কী ভাবে ব্যাপারটা ঘটল ?"

যদিও হোম্‌স অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলো বললে, আমার কিন্তু বুঝতে কষ্ট হল না যে, মনে-মনে সে কতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তার এই বাইরের ধীরস্থির ভাবের আড়ালে কী প্রচণ্ড চঞ্চলতা ঢাকা রয়েছে।

"'ওয়াটারলুর কাছে ট্রাজেডি' বলে যে খবরটা বেরিয়েছে তাতে জন ওপ্‌নশয়ের নামটা আমার চোখে পড়ে। এই যে খবরটা পড়ছি, শোনো : 'গতকাল রাত্রি নটা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে পাহারা দেবার সময় এইচ ডিভিশনের পুলিশ কনস্টেবল কুক একটা আর্তনাদ আর তার সঙ্গে-সঙ্গে জলে পড়ে যাবার ঝপাস শব্দ শুনতে পায়। গত রাত্রিতে ঝড়-জলের আর অন্ধকারের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোকজনের সাহায্য পাওয়া গেলেও জলে পড়ে যাওয়া লোকটিকে সঙ্গে-সঙ্গে জল থেকে তোলা যায়নি। যা হোক তৎক্ষণাৎ বিপদসংকেত দেওয়া হয় এবং জলপুলিশের সাহায্যে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে লোকটির মৃতদেহ নদী থেকে তোলা হয়। লোকটির কোটপ্যান্ট পরীক্ষা করে একটি খাম পাওয়া যায়। তার থেকে লোকটির যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তা হল, তার নাম জন ওপ্‌নশ, বাড়ি হর্শ্যাম। মনে হয় যে, ওয়াটারলু থেকে শেষ ট্রেন ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে অন্ধকারে সে পথ ভুল করে এবং স্টিমারঘাটের কিনারায় পা ফসকে নদীতে পড়ে যায়। যুবকটির দেহ ভালভাবে পরীক্ষা করে কোনো আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সন্দেহ নেই যে দুর্যোগের রাত্রিতে একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার শিকার তাকে হতে হল। আমরা আশা করব যে, এই ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ ঐ শহরের ওই অঞ্চলের ঘাটগুলির অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।'"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আগে কখনও হোম্‌সকে এরকম ভাবে মুষড়ে পড়তে দেখেছি বলে মনে হয়নি। একসময় নিস্তব্ধতা ভেঙে হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, আমার আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লেগেছে। তুমি বলতে পারো এ-ক্ষেত্রে আমার আত্মসম্মানের প্রশ্নটা খুবই তুচ্ছ। তা ঠিক। তবুও বলছি বিশ্বাস করো আমার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। জন ওপ্‌নশের ব্যাপারটা এখন আমার কাছে নিছক একটা কেস নয়, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ঈশ্বর সহায় হলে আমি এই দুষ্টচক্রের সবকটাকে শায়েস্তা করব। ওহ্, আমি ভাবতে পারছি না যে, যে-লোকটা আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এল তাকেই আমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলুম।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হোম্‌স ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার চোখমুখ, আর অস্থিরভাবে একবার হাত মুঠো করেই সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলার ভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, তার মনের মধ্যে ক্ষোভ, ক্রোধ আর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে কী প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করছে।

হোম্‌স বললে, "বুঝলে ওয়াটসন, এই শয়তানগুলো যেমন চতুর তেমনি বেপরোয়া। আমি শুধু ভাবছি কী কায়দায় ওরা ছোকরাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঐ রাস্তায় নিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি স্টেশনে যেতে হলে নদীর বাঁধের রাস্তা দিয়ে কেউ যায় না। ওটা তো ঘুরপথ। যদিও কাল খুবই দুর্যোগ ছিল, তবুও ব্রিজের রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত ছিল, তাই ওদের পক্ষে

কাজ হাসিল করা শক্ত হত।... আচ্ছা এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে হারে আর কে জেতে। ওয়াটসন, আমাকে এখনই বেরুতে হবে।"

"কোথায়? পুলিশের কাছে?"

"না। আমার পুলিশ তো আমি নিজেই। দাঁড়াও, আগে ওদের চারদিকে ভাল করে বেড়াজাল বিছিয়ে দিই, ওরা জালে পড়ুক, তখন পুলিশকে খবর দেওয়া যাবে। তার আগে পর্যন্ত যা করবার তা আমাকেই করতে হবে।"

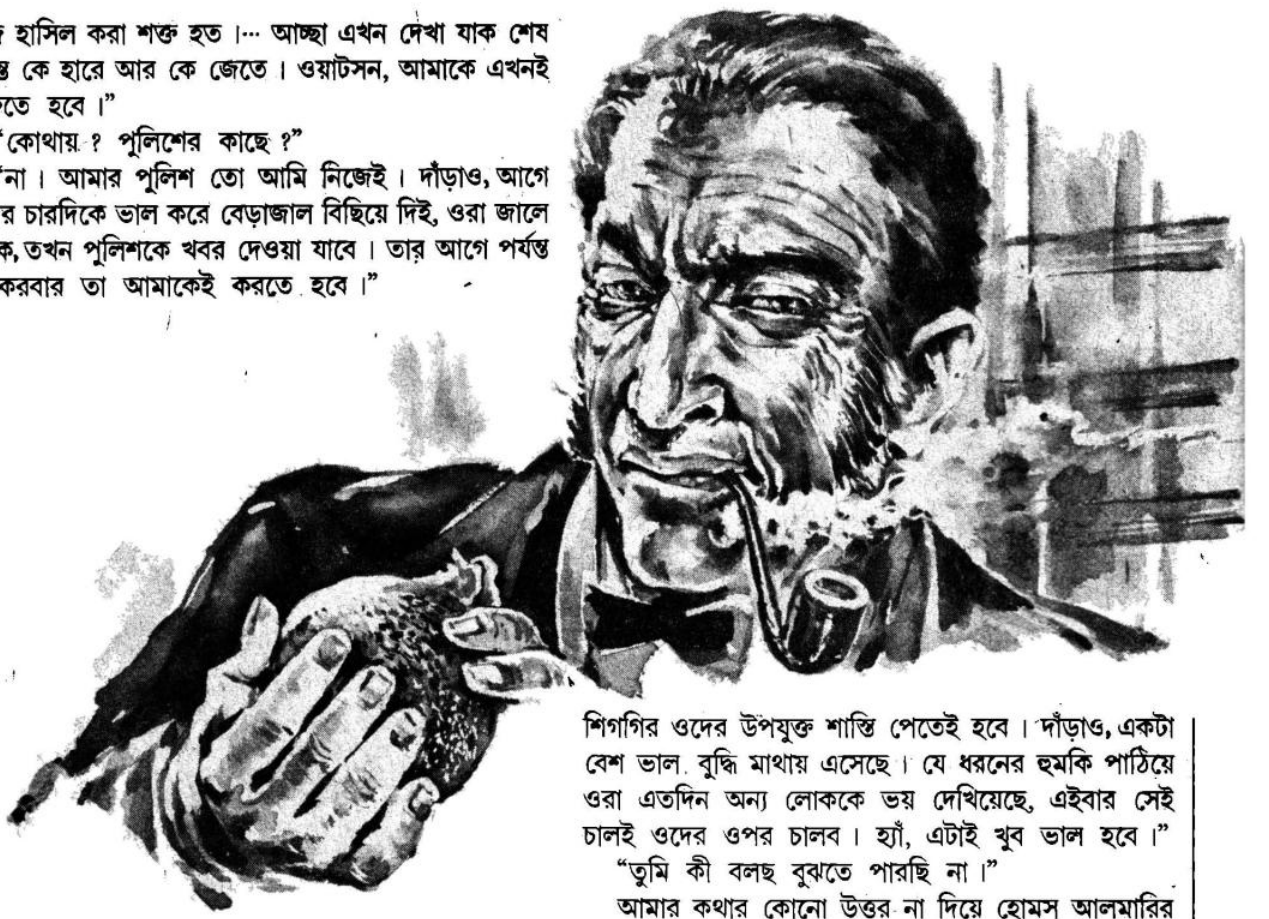

হোম্‌স চলে যাবার খানিক বাদে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। রুগি দেখতেই সারাদিনটা কেটে গেল। যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলুম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। হোম্‌সের তখনও পাত্তা নেই। হোম্‌স যখন ফিরে এল তখন ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে। তাকে ঠিক ঝোড়ো-কাকের মতো দেখাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই হোম্‌স সিধে চলে গেল আলমারির কাছে। তারপর আলমারি থেকে একটা পাউরুটি বের করে সেটা এক গেলাস জল নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

আমি বললুম, "তোমার দেখছি খুব খিদে পেয়েছে।"

"হুঁ, বলতে পারো উপোসি ছারপোকা। সেই সকালবেলায় চায়ের সঙ্গে যা খেয়েছি। খাবার কথা আমার মনেই ছিল না।"

"সারাদিন কিছুই খাওনি?"

"না। একটি দানাও পেটে পড়েনি। আর তাছাড়া আমার খাবার সময়ই ছিল না।"

"তা তোমার কাজ কেমন হল?"

"ভালই হয়েছে বলতে পারো।"

"তা হলে তুমি ব্যাপারটার হদিস করতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ, ওরা এখন বলতে গেলে আমার হাতের মুঠোয়। বেচারা জন ওপ্‌নশকে অকারণে হত্যা করার জন্যে খুব শিগগির ওদের উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। দাঁড়াও, একটা বেশ ভাল বুদ্ধি মাথায় এসেছে। যে ধরনের হুমকি পাঠিয়ে ওরা এতদিন অন্য লোককে ভয় দেখিয়েছে, এইবার সেই চালই ওদের ওপর চালব। হ্যাঁ, এটাই খুব ভাল হবে।"

"তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হোম্‌স আলমারির মাথা থেকে একটা কমলালেবু নিয়ে এল। তারপর সেটার খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো টিপে টিপে বীজগুলো বের করে নিল। সেই বীজগুলোর থেকে দেখেশুনে পাঁচটা বীজ বেছে নিয়ে সেগুলোকে একটা খামের মধ্যে পুরে খামের ভেতরে এককোণে লিখলে 'জে. সিকে এস. এইচ'। খামটা আঠা দিয়ে বন্ধ করে নিজের শিলমোহর মেরে দিলে। খামের ওপরে ঠিকানার জায়গায় লিখলে: ক্যাপ্টেন জেম্‌স ক্যাল্‌হন, লোনস্টার জাহাজ, সাভানা, জর্জিয়া।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে হোম্‌স বললে, "ব্যস, বন্দরে পৌঁছনো মাত্রই জেম্‌স ক্যাল্‌হন এই চিঠিটি পাবেন। আর এইটে পাবার পর, আর যাই হোক, তাঁর রাত্তিরের ঘুমটা সে রকম গাঢ় হবে না। জন ওপ্‌নশের বেলায় কমলালেবুর বীজ যেমন মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে দেখা দিয়েছিল, জেম্‌স ক্যাল্‌হনের বেলায়ও ঠিক তাই হবে।"

"কিন্তু এই ক্যাপ্টেন ক্যালহন্‌টি কে?"

"এই সমিতির পাণ্ডা। ওদের দলের প্রত্যেককেই ধরব। তবে নাটের গুরুকে দিয়েই শুরু করব।"

"আচ্ছা হোম্‌স, এ-সব তুমি জানলে কী করে?"

আমার কথার উত্তরে হোম্‌স পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বের করলে। কাগজটার আগাগোড়া নাম আর তারিখে ভর্তি।

"আজ সারাদিন আমি লয়েড কোম্পানির আপিসে বসে তাদের পুরনো রেজিস্টার আর নথিপত্র ঘেঁটেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল '৮৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কোন্-কোন্ জাহাজ পণ্ডিচেরি বন্দরে থেমেছিল আর

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৪ নভেম্বর তারিখের আনন্দমেলায় দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড গার্লস' হাইস্কুল সম্পর্কে যে রচনাটি ছাপা হয়েছিল, তাতে শ্রীমতী নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানা শিক্ষিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেন যে, বস্তুত তিনি এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্তা প্রধানা শিক্ষিকা।

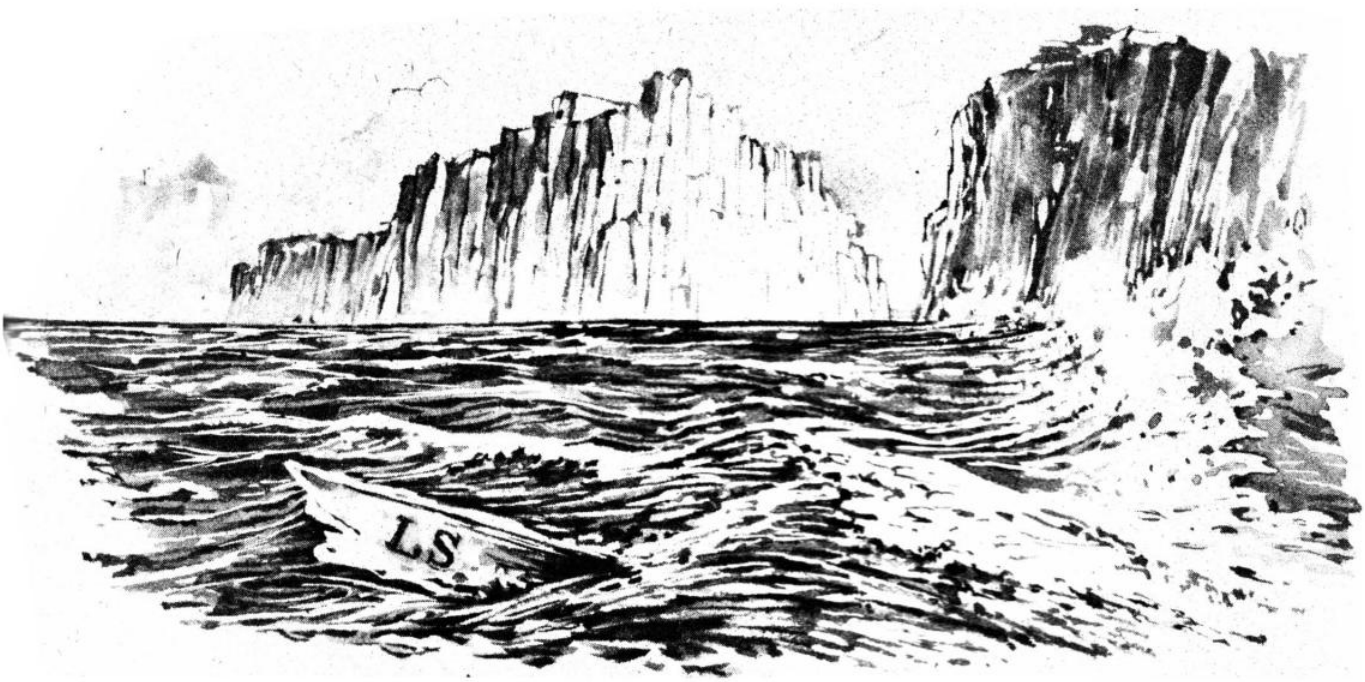

তারপর সেগুলো কোন্-কোন্‌দিকে গেছে সেটা জানা। মোট ছত্রিশটা বড় আকারের জাহাজ ওই-দুমাসের মধ্যে পণ্ডিচেরি বন্দরে থেমেছিল। তখন আমি ঐ জাহাজগুলোর পরিচয় মানে কোন্ দেশের জাহাজ কার জাহাজ কোন্-কোন্ দেশে যায় এবং কোথায় জাহাজগুলো রেজিস্ট্রেশন করা—এই সব খবর সংগ্রহ করতে লাগলুম। এর মধ্যে লোনস্টার জাহাজটাকে আমার সব চেয়ে সন্দেহজনক বলে মনে হল। কেননা, যদিও কাগজে-কলমে লেখা রয়েছে যে, জাহাজটা লণ্ডন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে কিন্তু সেখানে যে নাম দেওয়া আছে সেটা আমেরিকার একটি প্রদেশের।"

আমি বললুম, "কী, টেক্সাস নাকি?"

"না, তা মনে পড়ছে না। তবে আমি নিশ্চিত যে, জাহাজটা আমেরিকার।"

"তারপর কী হল?"

"তখন যে-সব জাহাজ ডান্‌ডিতে থেমেছিল সেগুলোর খোঁজ করতে লাগলুম। দেখলুম 'লোনস্টার' '৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ডান্‌ডিতে থেমেছিল। এই খবরটা জানবার পর আমার মনে যে সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, সেটা সত্যি হয়ে উঠল।

"লয়েডের আপিস থেকে বেরিয়ে আমি গেলুম অ্যালবার্ট ডকে। ডকে পৌঁছে খবর পেলুম যে, আজ সকালের জোয়ারেই লোনস্টার তার নিজের দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছে। তবে প্রথমে সে সাভানায় থামবে। আমি তৎক্ষণাৎ গ্রেভস এণ্ডে টেলিগ্রাম করলুম। জানতে পারলুম যে লোনস্টার অল্প কিছুক্ষণ আগে সেখান দিয়ে চলে গেছে। সকাল থেকে যে-রকম জোর হাওয়া দিচ্ছে তাতে আমার মনে হয় যে, লোনস্টার এতক্ষণে গুডউইনস ছাড়িয়ে আইল অব ওয়াইটের কাছাকাছি চলে গেছে।"

"তাহলে এখন তুমি কী করবে?"

"আরে আমি তো তোমাকে বললুম যে, ওরা আমার মুঠোর মধ্যে। আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে, ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন আর দু'জন নাবিক হচ্ছে আমেরিকার লোক। বাকিরা হয় জার্মান নাহয় ফিন। আরও জানতে পেরেছি যে, ওই তিনজন লোক গত রাত্রে জাহাজে ছিল না। এ-খবরটা আমি জাহাজে মালতোলা কুলিদের কাছে পেয়েছি। লোনস্টার সাভানায় পৌঁছবার আগেই ডাকবাহী স্টিমার আমার ঐ চিঠি সাভানায় পৌঁছে দেবে। আর ইতিমধ্যে সাভানার পুলিশের কাছে লণ্ডন পুলিশ টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেবে যে, ওই তিনজনকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের যেন ফেরত পাঠানো হয়।

মানুষ যত হিসেব-নিকেশ করেই কোনো পরিকল্পনা করুক না কেন, অনেক সময় সব হিসেব বানচাল হয়ে যায়। আর এইরকম এক অভাবনীয় কারণে জন ওপ্‌নশের হত্যাকারীদের হাতে তাদের নামে পাঠানো কমলালেবুর বীজসমেত খাম পৌঁছয়নি। তাতে তাদের ক্ষতি তো হয়নি, বরং লাভই হয়েছে বলা যায়। তাদের পেছনে যে তাদের চেয়ে ঢের বেশি নাছোড়বান্দা এবং ঢের বেশি বুদ্ধিমান এমন একজন লোক ধাওয়া করেছে, যে তাদের অপরাধের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না, এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে তারা বেঁচে গেছে।

বহুদিন অপেক্ষা করেও আমরা লোনস্টারের কোনো খবর পাইনি। সে-বছর অবশ্য অন্যান্য বছরের তুলনায় সামুদ্রিক তুফান খুব বেশি হচ্ছিল। বেশ কিছু কাল পরে আটলান্টিক মহাসাগরে একটা কাঠ ভাসতে দেখা যায়। কাঠটার গায়ে 'এল এস' এই অক্ষর দুটো খোদাই করা ছিল। এর পরে লোনস্টারের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। (সমাপ্ত)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

শার্লক হোমসের গল্পমালায় নতুন গল্প

ওষ্ঠবক্র রহস্য

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধাঁ

শীতকালের বাজারের যে একটা আলাদা চেহারা, সেটা আমাদের বারান্দা থেকেই এখন টের পাওয়া যায়। বাজারের বাইরে প্রথমে বসত একজন-দুজন। কেউ ফল নিয়ে, কেউ-বা ফুল। এখন সেটা বাড়তে-বাড়তে এমনই দাঁড়িয়েছে যে, পুরো গলিটা জুড়েই যেন বাজার-এলাকার সম্প্রসারণ। কী না বিক্রি হয় এখন বাজারের গলিতে। তরি-তরকারি, ফল-মূল, মাছ-ডিম । এমন-কি, রবিবারে-রবিবারে একটা মাংসের দোকান পর্যন্ত চাকা-লাগানো গাড়ি করে আসতে দেখা যাচ্ছে আজকাল। সকালে আসে, বেলার দিকে উধাও হয়ে যায়। আর, এ-সমস্তকিছুই আমরা দেখতে পাই বারান্দায় দাঁড়ালে। বাজারের ভিতরে না গিয়েও মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কী উঠল, কী না-উঠল।

সেদিন আমি আর ছোট্কা দাঁড়িয়ে দেখছি। শীতকালের ফল আর সবজিতে ভরা বাজার। হঠাৎ ছোট্কা বলল, "মুখে-মুখে একটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারবি ?"

আমি বললাম, "চেষ্টা করতে পারি। তবে কিনা ধাঁধাটা যদি সহজ হয়, তাহলেই।"

"খুব সহজ।" ছোট্কা বলল। বলল ধাঁধাটাও। সেটাই দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ বাজার থেকে তিনটে ডিম কিনেছেন একজন। এর মধ্যে দুটো টাট্কা। সে-দুটোর ওজনও এক। একটা ডিম নষ্ট, সেটায় ওজন অন্য দুটোর তুলনায় বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে।

ডিম তিনটেকে, ধরা যাক, চিহ্ন দেওয়া হল— ক, খ ও গ। এবার একটা নিখুঁত দাঁড়িপাল্লায় দু-দিকে ডিম বসিয়েই শুধু দু-বার ওজন করা হল। প্রথমে ক ও গ।

প্রথমবার দেখা গেল, ক ও গ-এর ওজন এক। দ্বিতীয়বার, একদিকে চাপানো হল গ, অন্যদিকে খ। এবার দেখা গেল, খ-এর ওজন গ্ব-এর তুলনায় বেশি।

কোন্ ডিমটা নষ্ট ? ক, খ, না গ ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আটটা ৪-কে এমনভাবে সাজাও যাতে যোগফল হয় ৫০০।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

করোচখমু

গতবারের উত্তর। (১) চার বছর আগে। (২) ৬৬। (৩) গতানুগতিক।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

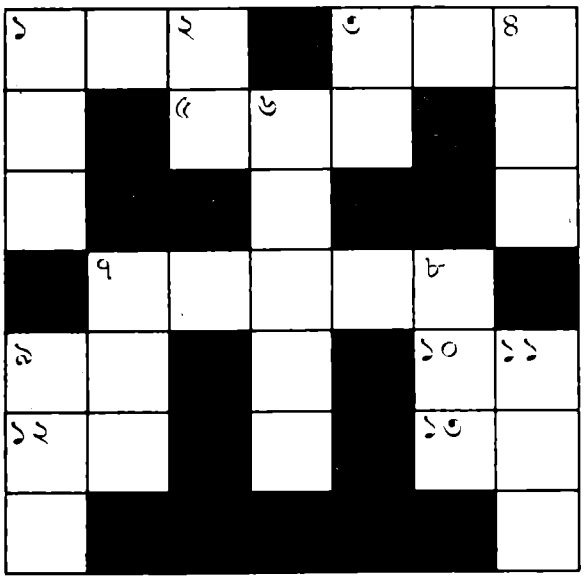

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সূর্য। (৩) মাছবিশেষ। (৫) যার মধ্যে মুক্তো থাকে। (৭) অদৃশ্য জলযান। (৯) সম্মানসূচক সম্বোধন। (১০) সবচেয়ে দরকারি ধাতু। (১২) অস্ত্রবিশেষ। (১৩) করণীয় বিষয়।

উপর-নীচ : (১) সুগন্ধি কাঠ। (২) মা ও মেয়ে মিলে কোন্ শব্দ ? (৩) ব্যাঙ। (৪) মুকুট। (৬) ঐতিহাসিক নারী-চরিত্র। (৭) জলের নীচে যাদের কাজ-কারবার। (৮) রক্তপায়ী কীট। (৯) গোরুর শৈশব-অবস্থা। (১১) যা হজম করায়।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বি	র	স	■	মি	শু	ক
প্র	ত্ন	■	আ	■	ক	পি
তী	■	মা	দ	ল	■	ধ্ব
প	ক্ষ	■	ম	■	তা	জ
■	প	র	শু	রা	ম	■
প	ণ	■	মা	■	র	শি
ট	ক	■	র	■	স	ম

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই এক ডজন দেশলাইকাঠি অথবা সমান মাপের বারোটা টুথপিক। বারোটা কাঠিকে সাজাতে হবে টেবিলে, তাও অতি সহজ ও সাধারণ। কেবল চারটে সমান মাপের বর্গক্ষেত্র।

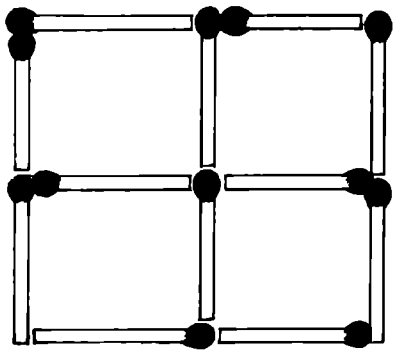

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, এর থেকে মাত্র দুটো কাঠিকে তুলে ফের এমনভাবে বসাতে হবে যে, টেবিলে তৈরি হবে সাতটা বর্গক্ষেত্র।

মনে রাখবে, এবার কিন্তু "সমান মাপের' বর্গক্ষেত্র বলছ না। কেন বলছ না, তা কি জানো ?

এর কারণ জানতে গেলে তো সমাধানটাই করে দেখাতে হয়। সেটা কি এখনই দেখানো উচিত হবে ? না। নিজে আগে চেষ্টা করো উত্তর করতে। করেছ ? বেশ। তাহলে নিশ্চয়ই তোমার সমাধানটা অনেকটা এই ধরনের হয়েছে—

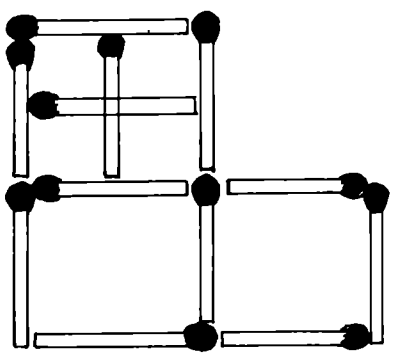

কী, তোমার সঙ্গে মিলেছে তো ?

মজারু

হাসিখুশি

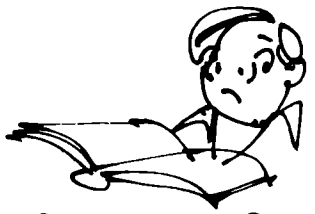

"সামনে অভিধান খুলে রেখে কী ভাবছ পাপান ?"

"ভাবছি, এত শক্ত-শক্ত শব্দগুলো কি না লিখলে চলছিল না ?"

"বাঁদর দেখলেই আমার খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। এর কারণটা কী বলতে পারো ?"

"স্বজাতিপ্রীতির লক্ষণ ছাড়া কিছু নয়।"

"তোমার বাবা বলেন, তুমি নাকি অঙ্কে খুব খারাপ। এই তো দেখছি অঙ্কে আশি পেয়েছ।"

"আশির 'আট'টা তো আমি নিজে বসিয়েছি।"

দাদু জিজ্ঞেস করলেন নাতিকে, "বলো তো বাবুয়া, 'আমি বাদামভাজা খাব'—এটি কোন্ কাল ?"

চটপট উত্তর দিল বাবুয়া, "অতীত কাল, দাদু।"

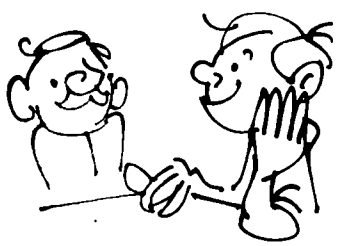

"সেদিন আপনাদের রেস্টুরেন্ট থেকে চারটে কাটলেট নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বেশ তো। আজ কী দেব বলুন ?"

"কিছু না। শুধু আপনারা কেরোসিন তেলে কীভাবে কাটলেট ভাজেন একটু বলবেন ?"

"হনুমানের উপর একটা লেখা তৈরি করতে হবে। কিছু বইপত্রের সন্ধান দিতে পারো ?"

"হঠাৎ নিজের সম্পর্কে এত উৎসাহ যে ?"

"পকেটে খুচরো পঞ্চাশ পয়সা ছিল। তার থেকে কে পঁচিশ পয়সা নিয়েছে ?"

"তবে যে বলো, তুমি নাকি অঙ্ক জানো না !"

"তোমাকে অমলকাকু মারলেন কেন পাপান ?"

"লোকজনের সামনে আমি কাকুকে 'ষণ্ণবতি' মানে কী, জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে।"

ছবি : অহি ভূষণ মালিক

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

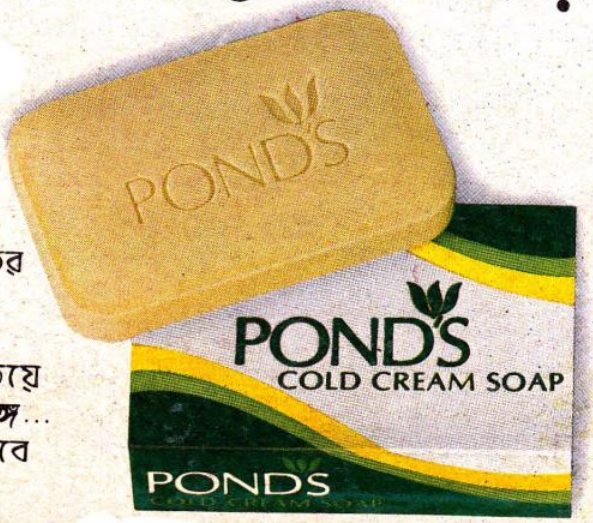

নতুন
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম সাবান
পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

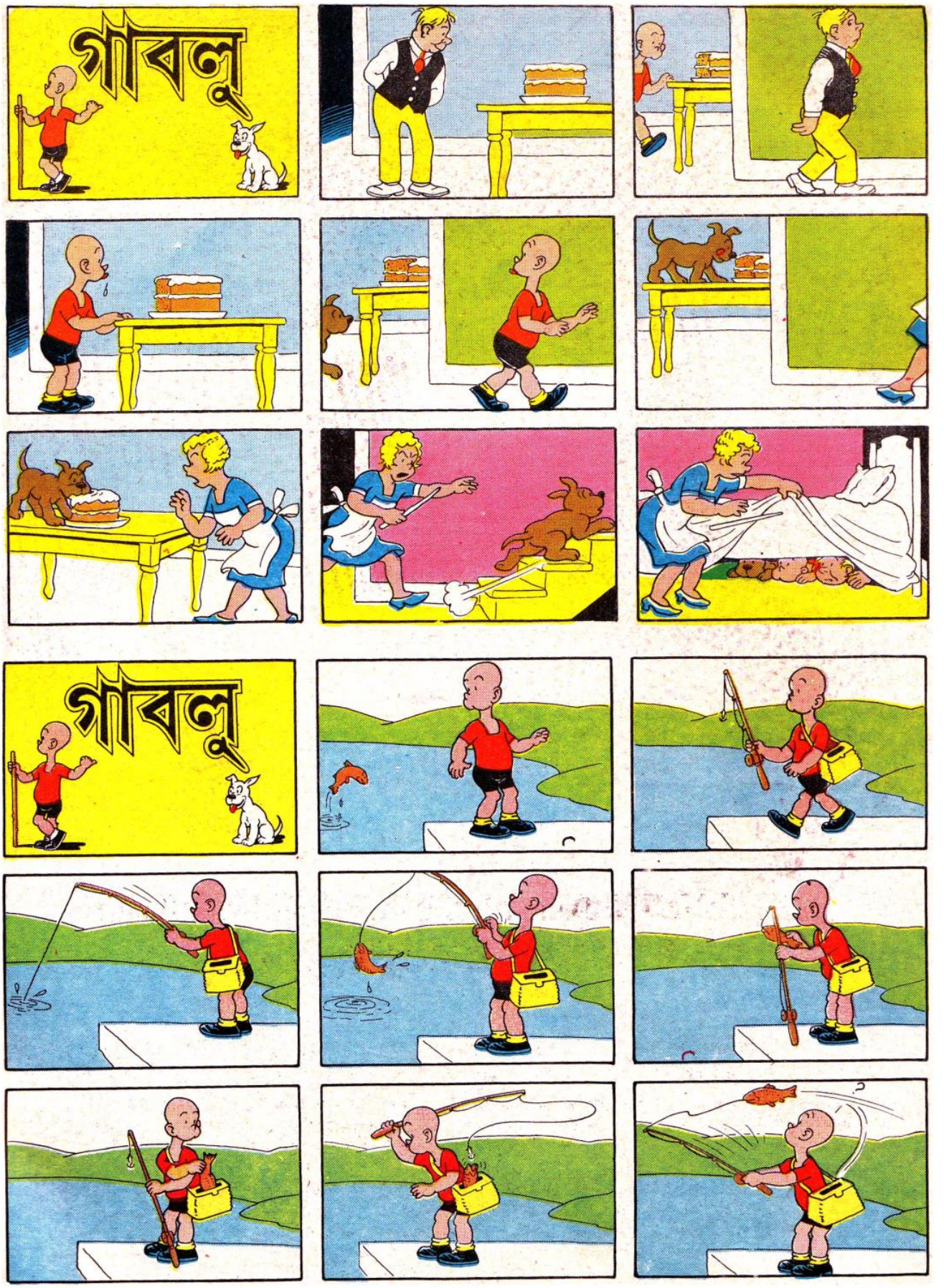
গাবলু
গাবলু

ইংরেজদের দিল্লি দখল

অশোক রায়

দিল্লি টেস্টের শুরু এবং শেষে কোনো মিল নেই ! ভারত এই টেস্ট শুরু করেছিল ১-০ মার্জিনে এগিয়ে থেকে, টসে জিতে এবং অহঙ্কারের চুড়োয় বসে। আর শেষ করল সিরিজ জয়ের সম্ভাবনার পাশে মস্ত একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন চাপিয়ে। বোম্বাইতে প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডকে হারানো মাত্রই অনেকে বলতে শুরু করেছিলেন, গাওয়ারের ইংল্যাণ্ড খুবই 'দুর্বল'। দিল্লি দখলের পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওই শব্দটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা আর সম্ভব হবে কি ?

প্রথম দিনে এক ঘণ্টা পর থেকেই বল ঘুরেছে। এবং ভারতীয় শিবির উল্লসিত হয়েছে এই ভেবে যে, চতুর্থ ইনিংসে এই পিচে ভারতের তিন স্পিনার ইংরেজদের রুমালে বেঁধে ফেলবেন। ভারত প্রথম দফায় বড় রান গড়তে না-পারার পেছনে পিচের কোনো রহস্যময় ভূমিকা নেই। কপিলদেবের ষাট রানের ইনিংসটি ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যান 'ফিফ্‌টি'র স্বাদ নিতে পারেননি এলিসনের পেস এবং পোককের স্পিনের শাসানিতে। ৩০৭ রানের জবাবে ইংল্যাণ্ড ৪১৮ রানে পৌঁছয় রবিনসনের ম্যারাথন ১৬০ রানের সহায়তায়। জীবনের তৃতীয় টেস্ট ইনিংসেই রবিনসন জানালেন,

এডমণ্ডস (স্পিনে কি সত্যি জাদু ছিল ?)

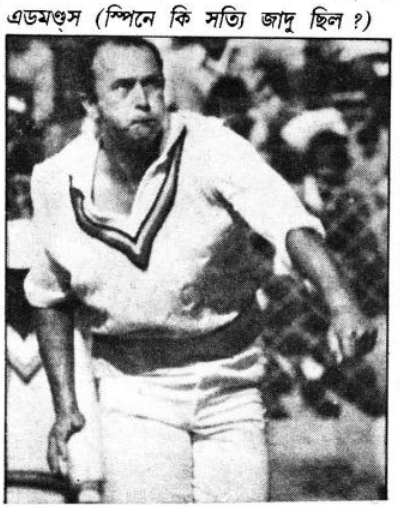

'কপিলের সেই বিতর্কিত শট (যার ফলে তিনি দল থেকে বাদ পড়লেন ?)

আগামী বেশ কিছুদিনের জন্যে ইংলিশ ব্যাটিংকে নিরুদ্বিগ্ন রাখার দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত। উইকেট-কিপিং গ্লাভসের মতো ব্যাট হাতেও যে কিছু কম যান না সেই প্রমাণ দিলেন ডাউন্টন (৭৪)। জীবনের প্রথম টেস্টে মনোজ প্রভাকর কিংবা একটানা ৬৬টি টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণকারী কপিলদেবের বলে বিপন্ন বোধ করার কোনো কারণ ঘটেনি ইংরেজদের। প্রথম টেস্টে লেগব্রেক আর গুগ্‌লিতে ইংরেজদের মাথা ধরিয়ে দিয়েছিলেন শিবরামকৃষ্ণন। এ-টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ইংরেজদের যাবতীয় মনোযোগ ও সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি ছটা উইকেট নেন মাত্র ৯৯ রানে। উপর্যুপরি তিনটি ইনিংসে ছটি করে উইকেট নেবার কৃতিত্ব প্রমাণ করল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে উনিশ বছরের কিশোরের লড়াইটি বেশ জমেছে।

ভারত ১১১ রানে পিছিয়ে থেকে ইনিংসের শুরুতেই দু' উইকেট হারিয়ে বিপদের মুখোমুখি হয়। ফলে গাওস্কর এবং মহিন্দর অমরনাথকে নামতে হয় ইনিংস মেরামতির কাজে। কিন্তু অল্প ব্যবধানে ওঁরা ফিরে যেতেই ভারত আবার আক্রান্ত হয় এডমণ্ডস ও পোককের স্পিনে। উইকেটে জুজু ছিল না, কিন্তু স্পিন-আক্রমণের আতঙ্কে ভারত তখন দিশেহারা। শীতের ঝরাপাতার মতো উইকেট পড়েছে টপাটপ। শেষ দিন লাঞ্চ পর্যন্ত যে ম্যাচটা নিশ্চিত ড্রয়ের দিকে যাচ্ছিল, সেটা নাটকীয়ভাবে মোড় নিল ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে। মধ্যাহ্নভোজের পরে যেভাবে পাটিল প্যাভিলিয়ানে ফিরলেন, মনে হল, ভোজনের মাত্রাটা যেন বেশিই হয়েছে, এখন তাঁর দিবানিদ্রা দরকার। কপিলের উচ্ছৃঙ্খল শটটি তাঁর পূর্ববর্তী বহু স্মরণীয় কীর্তিকে মন থেকে মুছে দিল বিতৃষ্ণায়। দেশের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের কোনো ক্ষমা নেই। শেষ পর্বে গায়কোয়াড়, কিরমানি, যাদব, শিবরামকৃষ্ণন হঠাৎই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের 'ল্যাজ'টির আকার বাড়িয়ে দিলেন। ফলে ভারত মুড়িয়ে গেল মাত্র ২৩৫ রানে।

একটা হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ এসে গেল ইংল্যাণ্ডের নাগালের মধ্যে। মাত্র ১২৫ রান করলেই জয় এবং সিরিজে সমতা ফিরবে, এই অত্যাশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র দু' উইকেট খুইয়েই ইংল্যাণ্ড জয়ে পৌঁছে গেল।

এই লেখা শেষ করার আগেই খবর এল, কটকে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং কলকাতা টেস্ট টিম থেকে কপিলদেব এবং পাটিলকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

লয়েডের পকেটে অস্ট্রেলিয়া

রাজা গুপ্ত

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে জেতার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটাররা যে দৃশ্যত খুশি ছিলেন, সেটা টের পাওয়া গেল ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচেও। ফর্মের তুঙ্গে-থাকা হেনস্ (১৫৫), গ্রিনিজ (৭৮), রিচার্ডসন (১৪৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৫৫৮ রানে পৌঁছে দেবার ফলে জানা গেল, ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে চার বছর আগের গড়া ৪৯৫ রানের রেকর্ডটি তলিয়ে গেছে। এই বিরাট রানের চাপে ভিক্টোরিয়ার কুঁকড়ে যাবারই কথা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলকে ক্রমাগত বিপর্যস্ত হতে দেখে ভিক্টোরিয়া সম্ভবত ইতিমধ্যেই কিছুটা মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ভিক্টোরিয়া জবাব দিল ৬০১ রান করে। ম্যাচ ড্র হল। এই ম্যাচে মিক টেলর ২৩৪ রানে নট আউট থেকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুরন্ত পেস বোলারদেরও শাসনে রাখা যায়, যদি 'টেকনিক' এবং 'টেম্পারামেন্ট'-এ কোনো ভুলচুক না থাকে।

ভিক্টোরিয়ার কাছে খোঁচা খেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এডিলেডে নামল তৃতীয় টেস্টের দখল নিতে। গ্রিনিজ (৯৫), গোমস (৬০), লয়েড (৭৮) ও দুজোঁর (৭৭) সহায়তায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৫৬ রানে পৌঁছয় প্রাথমিক ধাক্কা সামলে। অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারকে খুশি করেন ফাস্টবোলার জিওফ লসন তাঁর জীবনের সেরা বোলিং করে (১১২ রানে ৮ উইকেট)। হোল্ডিংবিহীন পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া শুরুটা করেছিল ভালই। কিন্তু মার্শালের দাপটে শেষপর্যন্ত পিছলে আসে ২৮৪ রানে। কনুইয়ে আঘাত নিয়ে ঝলমলে ইনিংস খেলেছেন কেপ্লার ওয়েসেলস্ (৯৮)। ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নিয়ে মার্শাল আরেকবার বোঝালেন কেন প্রায়ই তাঁর বোলিংয়ের সঙ্গে 'ভয়াবহ' শব্দটা জুড়ে দেওয়া হয়।

৭২ রানে এগিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ দিনের শেষে পৌঁছয় সাত উইকেটে ২৯২ রানে। সিরিজে দ্বিতীয় শতরান এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিজস্ব হাজার রান পূর্ণ করেন ল্যারি গোমস। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে আর না-খেলে লয়েড দান ছেড়ে দেন ৩৬৫ রানের দুর্বহ বোঝাটি অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের ঘাড়ে চাপিয়ে। একদিনে অস্ট্রেলিয়াকে অল আউট করার চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা। এবং ম্যাচ অমীমাংসিত রাখার ক্ষীণ সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দিয়ে প্রায় হাসতে হাসতে অস্ট্রেলিয়াকে ফালাফালা করে চিরে ফেলেন মাত্র ১৭৩ রানে। মার্শাল দ্বিতীয় দফাতেও অস্ট্রেলিয়ানদের ভাঙলেন মাত্র ৩৮ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে। হোল্ডিংয়ের জায়গায় খেলতে নেমে স্পিনার রজার হার্পারও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁর সংগ্রহ চারটি উইকেট, মাত্র তেতাল্লিশ রানের বিনিময়ে। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েসেল্‌স সংগ্রামী ব্যাটিং করলেন (৭০)।

পরপর তিনটি টেস্ট জেতার সুবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ জিতল। ঘটনাটি এই কারণে আরও মনে রাখার মতো যে, এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে আর কখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ জিতে নিয়ে যেতে পারেনি। জয়লোলুপ লয়েডের একটানা ১১টি টেস্ট জেতার রেকর্ডে অস্ট্রেলিয়ার নতুন ক্যাপ্টেন বর্ডারও কোনো সীমারেখা টানতে পারলেন না।

একটানা এগারোটি টেস্ট জিতে রেকর্ড করলেন লয়েড

ল্যারি গোমসের ব্যাট চালাবার অকুতোভয় ভঙ্গিমা

মধ্যপ্রদেশের সোঙ্কারের 'স্ট্রেট রাইট'-এ ছোবল ছিল ; কিন্তু লড়াই জিতেছেন বাংলার তরুণ কর্মকার ফটো : সন্তোষ ঘোষ

কলকাতায় জাতীয় বক্সিং

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরো সংখ্যাটিকেই সৌভাগ্যের সোপান করেছিলেন বাংলার ব্যান্টাম ওয়েট বক্সার তরুণ কর্মকার। একত্রিশতম জাতীয় বক্সিংয়ের তৃতীয় দিন তেরোই ডিসেম্বর বাংলার বক্সিং দুলে উঠেছিল আসাম রাইফেলের জওয়ান সুনারের বিরুদ্ধে গার্ডেনরিচের ছাত্র তরুণের জয়ে। মধ্যপ্রদেশের সোঙ্কারও পথ ছেড়ে দেন ওঁকে। সেমি-ফাইনালে হল অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের লড়াই। সুন্দর ফুটওয়ার্কে জ্যাব আর আপার-কাট নিয়ে বারবার আক্রমণ করেও রেলের সুব্রমনির ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি তরুণ। অজস্র ঘুসি চালিয়েছেন, তবে তার বেশির ভাগই ছিল সুব্রমনির গার্ড— দুটো হাতের ওপর। 'তরুণের ফিজিক্যাল কণ্ডিশনিং দরকার', বলেছেন রেলের কোচ ন-বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তথা একমাত্র সিভিলিয়ান বক্সার 'অর্জুন' বাডি ডি সুজা। 'আর চাই ভাল কোচের তত্ত্বাবধানে অন্তত ছ-মাস ট্রেনিং। এটা ওর জেতা লড়াই। প্রয়োজন ছিল একটু দেখে দেখে কিছু স্কোরিং পাঞ্চ।' সুব্রমনিকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে দেননি ফৌজি সম্মুগমের সাইন্টিফিক বক্সিং।

বক্সিংয়ের কিংবদন্তি জো লুইয়ের বিখ্যাত জ্যাব আর আপার-কাট রিংয়ে কত কার্যকর তা দেখিয়েছেন এবারের 'বেস্ট বক্সার' ফৌজি ফেদারওয়েট নিত্যানন্দন। শ্যামলা, ছিপছিপে বক্সারটির লম্বা হাতের কেতাবি ঘুসি দু-রাউণ্ডেই রেফারির সিদ্ধান্ত আদায় করে নেয় ফাইনালে।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তেইশ দলের দেড়শো বক্সারের ছ-দিনব্যাপী এই মর্যাদার লড়াই বেশ জমে ওঠে শেষ দিনে। লাইটওয়েটে রেলের মতিভানন আর ফৌজি জেভিয়ার। ক্লোজ-রেঞ্জের ঘুসি আপার-কাট, হুকের ছোবলে জর্জরিত দুজনেই। সজাগ মাংসপেশি আর ঝড়ের গতি এগিয়ে দিল জেভিয়ারকে। মতিভানন পান 'বেস্ট লুজার'। এটিই সেরা লড়াই।

স্টিল প্ল্যান্টের সম্ভাবনাময় লাইটফ্লাই গুরুমূর্তি চোখ-জুড়নো বক্সিং দেখাতে চেয়েছিলেন। বাঁ-হাতি গুর্খা বক্সার লোকবাহাদুর গুরুং পাথর-ভাঙা ঘুসিতে বিষদাঁত ভেঙে নিস্তেজ করে দেন ওঁকে।

ফ্লাই কামলের বক্সিং ঠিক ফৌজি ঘরানার নয়। ওঁর ঘুসি কাঁধ থেকে নয়, আসে মগজ থেকে। আপার-কাট-হুকের অব্যর্থ কম্বিনেশন নিয়ে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। আর একজন উল্লেখযোগ্য বক্সার গোপাল দেওয়াং। রকমারি জোরালো শর্ট, পাঞ্চে ভরা ওঁর ঝুলি। রেলের রিজার্ভ বক্সার গুপ্তা ওঁর ঘুসি হজম করতে না পেরে দু-রাউণ্ডেই অবসর নেন। অন্য পাঁচ ফৌজি বীর জয়রাম, মনজিৎপাল, সত্যনারায়ণ, মুক্তার সিং দলে নবাগত। আন্তর্জাতিক রিংয়ে পরিচিত ক'জনের জায়গা নিয়েছেন ওঁরা। সম্ভাবনা আছে। দু-একটি বড় আসরের অভিজ্ঞতা ওঁদের আত্মবিশ্বাস এনে দেবে।

দুই 'শের-ই-পঞ্জাব' পলবিন্দর (রেল) ও জয়পাল ফৌজি রত্নহার থেকে এবারও দুটি রত্ন ছিনিয়ে নিয়েছেন।

আসাম ও মহারাষ্ট্রের বক্সিং এবার অন্যান্য রাজ্য থেকে এগিয়ে। ওঁদের পরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক। তামিলনাড়ুর বক্তব্য—ওদের ভাল বক্সাররা রেলের প্রতিনিধি। অনিবার্য কারণে পঞ্জাব পুরো শক্তি নিয়ে আসতে পারেনি। আর বাংলা ? তরুণ ছাড়া কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি রিংয়ে।

ছাপ্পান্ন পয়েন্ট পেয়ে সার্ভিসেস আবারও চ্যাম্পিয়ন। রেল তিরিশ পয়েন্টে রানার্স আপ। এ-লড়াই থেকে বাছাই দশজন যাবে ব্যাংককে এশীয় বক্সিং লড়তে। এদের তালিম চলছে সল্ট লেকে নতুন রিংয়ে। কোচ ওমপ্রকাশ ভরদ্বাজ, গুরুবক্স সিং সাঁধুর তত্ত্বাবধানে।

ভারত তলানিতে ঠেকল

নৃপতি চৌধুরী

কলকাতার পালা শেষ করে অষ্টম এশিয়া কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্বে খেলার জন্যে ভারত সিঙ্গাপুরে পৌঁছতেই আমরা মনে-মনে খুশির গান গাইতে শুরু করেছিলাম। দক্ষিণ কোরিয়া বাদে অন্যান্য দেশের বিপক্ষে যে খেলা ভারত সল্টলেক স্টেডিয়ামে দেখিয়েছিল তা চোখ জুড়ানো না হলেও অবশ্যই তারিফযোগ্য। সুতরাং সিঙ্গাপুরে উজ্জীবিত ভারত ,কার্যকর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু একেবারে প্রথম ম্যাচেই বিভাগের সবচেয়ে দুর্বল দেশ সিঙ্গাপুরের কাছে দু-গোল খেল ভারত। শুধু দুটো গোল খাওয়াই নয়, ভারতের ফরোয়ার্ডের গোলমুখে ব্যর্থতা ভাবনায় ফেলল ফুটবলপ্রেমীদের।

ভারতের যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভান ইংরেজি ভাল বলতে পারেন না। কিন্তু ভাষাগত অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ম্যাচে আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ যে তিনি ফুটবলারদের দিয়েছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় ছাত্ররা বৃষ্টিভেজা মাঠে গুরুদক্ষিণা দিল দুটি গোল খেয়ে। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং নরিন্দর থাপা এই ম্যাচেও দেখালেন গোল মিসের 'একজিবিশন'। শেষ বারো মিনিটে দুটি গোল হল ডিফেণ্ডারদের ত্রুটিতে। কৃষ্ণেন্দুর ভুল ট্যাকলিংয়ের রমরণে এবং তরুণের কভারিংয়ের ত্রুটিতে দুটি গোল খেল ভারত। ভারতের পক্ষে অনবদ্য গোলকিপিং করেছেন অতনু ভট্টাচার্য। এই খেলায় অতনুর 'ম্যান অব দি ম্যাচ' নির্বাচিত হওয়ার সংবাদটি ছিল ভারতীয়দের কাছে একমাত্র সান্ত্বনা।

ভারত বনাম ইরান

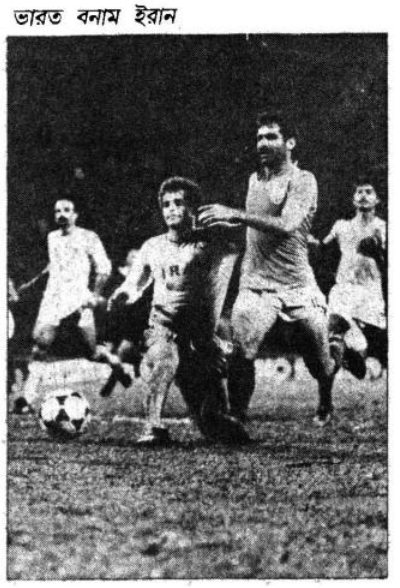

পয়েন্টের ঝুলি শূন্য রেখেই ভারত তৃতীয় ম্যাচে গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ইরানের বিপক্ষে নামল। এবং সত্যি বলতে কী, খেলল সেরা খেলাটাই। খেলার বয়স যখন মাত্র চার মিনিট তখন নরিন্দরের শট কোনোক্রমে আংশিকভাবে চাপড়ে ফেরত পাঠায় ইরানের গোলরক্ষক। ফিরতি বলে শট নেন বিশ্বজিৎ। নিয়ন্ত্রণহীন শটটি শেষপর্যন্ত নেটে ঢোকার পরিবর্তে মহাকাশ পরিভ্রমণের সুযোগ পায়। ভারতের প্রথম কর্নার কিকটিও বিশ্বজিৎ বাইরে মারেন আশ্চর্যভাবে। দু-দলই আক্রমণাত্মক ঢঙে খেলেছেন। ফলে পজিটিভ সুযোগ এসেছে দু-দলের সামনে। আক্রমণের মুখে তরুণ দে এবং প্রবীণ সুব্রত ভট্টাচার্য দারুণ খেলেছেন। তবু ডিপ-ডিফেণ্ডারদের ফাঁকি দিয়ে যে-সব ইরানি-ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, সেগুলি আটকে গেছে বারের নীচে সদা-সতর্ক গোলকিপার অতনু ভট্টাচার্যর হাতে।

চতুর্থ ম্যাচে চিনের বিরুদ্ধে ভারত প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন গোল খেল। ভারতের ফরোয়ার্ডরা চিনের প্রাচীরে ফাটল ধরাতে পারেনি। সারা খেলায় মাত্র দু'বার চিনের গোলরক্ষককে দুটি নরম শটে পরীক্ষা নেন বিশ্বজিৎ এবং বাবু মানি। ব্যস, খেল্ খতম ওখানেই! প্রত্যাশার বেলুনে ছুঁচ বিঁধিয়ে ভারত 'বি' গ্রুপে শেষ স্থান নিয়ে ঘরে ফিরল।

শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ অবশ্য জিতল সৌদি আরব, 'ফেভারিট' চিনকে হারিয়ে। আর গতবারের চ্যাম্পিয়ন কুয়েত টাইব্রেকারে ইরানকে হারিয়ে পেয়েছে তৃতীয় স্থান।

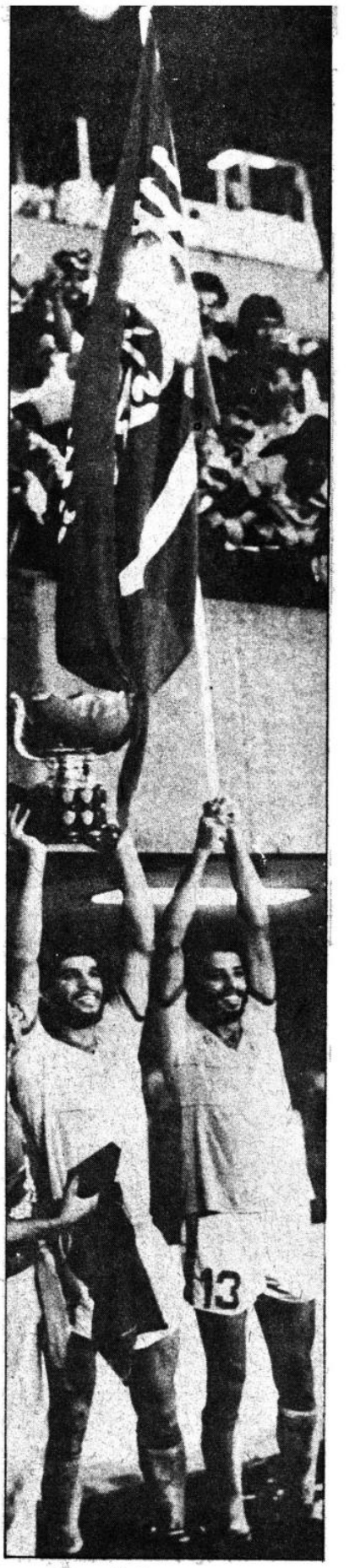

কাপ জিতল সৌদি আরব

দু-নম্বররা চ্যাম্পিয়ন

সম্রাট রায়

কোয়ার্টার-ফাইনালে তৃতীয় বাছাই পাম শ্রিভারকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে উনিশ বছরের যে মেয়েটি প্রথম নজর কেড়েছিল, সেই মেয়েটিই রাতারাতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল সেমি-ফাইনালে শীর্ষ-বাছাই

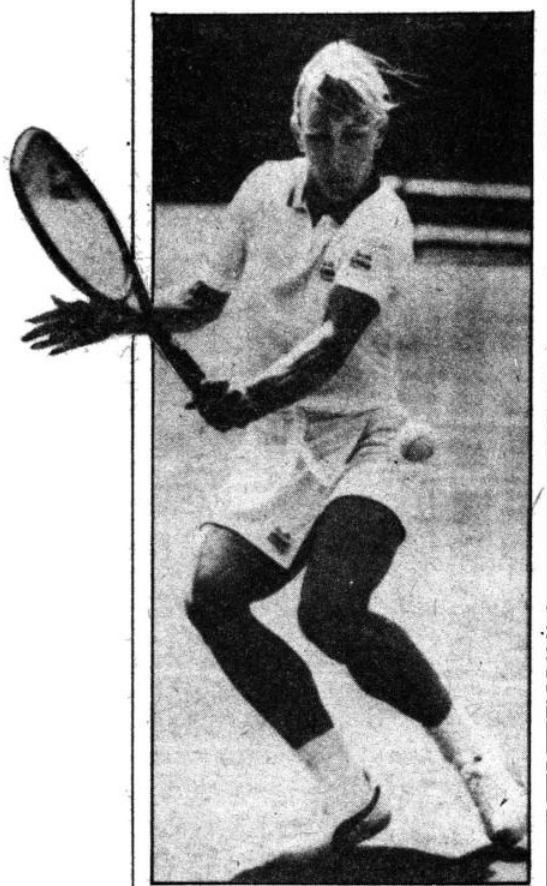

মার্টিনা (হেলেনার কাছে পরাস্ত)

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে হারাতেই। বিশ্ব টেনিসের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড়টিকে দুরন্ত সার্ভিসে তছনছ করে চেকোস্লোভাকিয়ার 'টিন-এজার' হেলেনা সুকোভা অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণাকেই ওলট-পালট করে দিয়েছে। ৬-১, ৩-৬, ৫-৭ গেমে পরাজিত হবার ফলে শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকেই নয়, শততম খেতাব জয় এবং তৃতীয় মেয়ে হিসেবে 'গ্র্যাণ্ড-স্ল্যাম' অর্জনের সম্ভাবনা থেকেও ছিটকে গেলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একদা এই হেলেনাই ছিল মার্টিনার বল-গার্ল।

ফাইনালে হেলেনার মুখোমুখি হয়েছিলেন মহিলা টেনিসের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় ক্রিস এভার্ট লয়েড। আশা ছিল মার্টিনা-জয়ী হেলেনা বনাম দু-নম্বর বাছাই এভার্টের লড়াই জমবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রথম গেমে ৬-৭-এ পিছিয়ে থেকেও পরের দুটিতে ৬-১, ৬-৩ গেমে হেলেনাকে হারিয়ে অনায়াসেই জয় তুলে নেন ক্রিস এভার্ট। শেষ পর্যন্ত রানার্স-আপের সম্মানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় হেলেনাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, হেলেনার মা ভেরা ১৯৬২ সালে উইম্বলডনে রানার্স-আপেই সন্তুষ্ট থেকে ছিলেন। মার্টিনাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে হেলেনা যে কতখানি সুবিধে করে দিয়েছে সেটা বোঝা যাবে যদি এই বছরের গত তিনটি প্রতিযোগিতার ফলাফলে দৃষ্টি ফেরানো যায়। উইম্বলডন, ফ্রেঞ্চ এবং ইউ· এস· ওপেনের তিনটি ফাইনালেই এভার্ট হেরেছিলেন নাভ্রাতিলোভার কাছে।

পুরুষদের সিঙ্গলসেও ঘটেছে ইন্দ্রপতন। কোয়ার্টার-ফাইনালে

ক্রিস (ফাইনালে হেলেনাকে হারালেন)

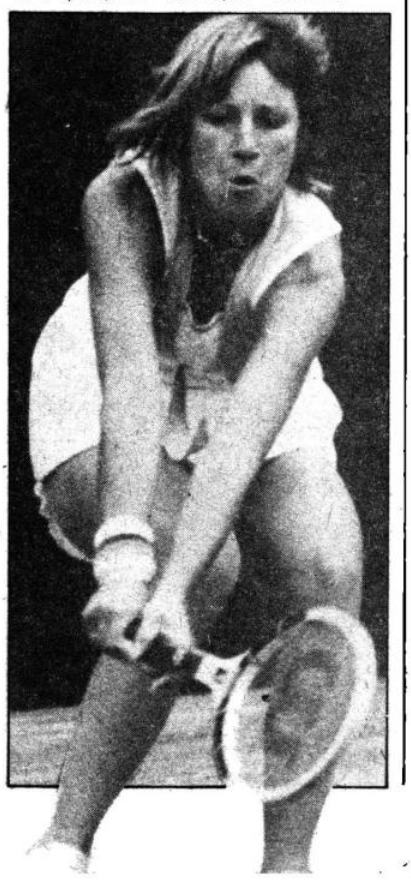

শীর্ষবাছাই ইভান লেণ্ডলকে সম্ভাব্য বিজয়ীর তালিকা থেকে ছিটকে দেন নবম বাছাই দক্ষিণ আফ্রিকার কেভিন কারেন ১-৬, ৭-৬, ৬-৪ গেমে। সেমি-ফাইনালে বেন্ চেস্টারম্যানের বিরুদ্ধে অতি কষ্টে জয়লাভ করেন কারেন। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় চেস্টারম্যান দখল করেন ২৩টি গেম, কারেন পান ২৪টি গেম। উলটো দিকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের ম্যাটস উইল্যাণ্ডার মাত্র ৬২ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের জোয়ান ক্রিয়েককে অতিক্রম করেন। শীর্ষ বাছাই ইভন লেণ্ডল ছিটকে

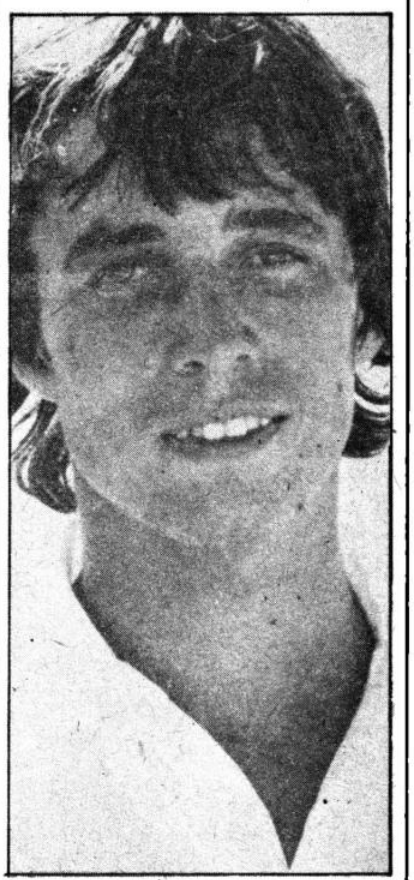

লেণ্ডল (কারেনের কাছে পরাস্ত)

যাওয়ায় দু-নম্বর বাছাই ম্যাটস উইল্যাণ্ডারের পক্ষে খেতাব রক্ষার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। ফাইনালে তিনি কেভিন কারেনকে পরাজিত করে· উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বিজয়ীর সম্মান লাভ করলেন।

এবারে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই শীর্ষবাছাইরা হেরে যাওয়ায় বিজয়ীর আসনে উঠে এলেন দু-নম্বর বাছাইরা।

টাকার চেক আর প্রেসক্রিপশন দুয়ের মধ্যে মিল কিছু পান ?

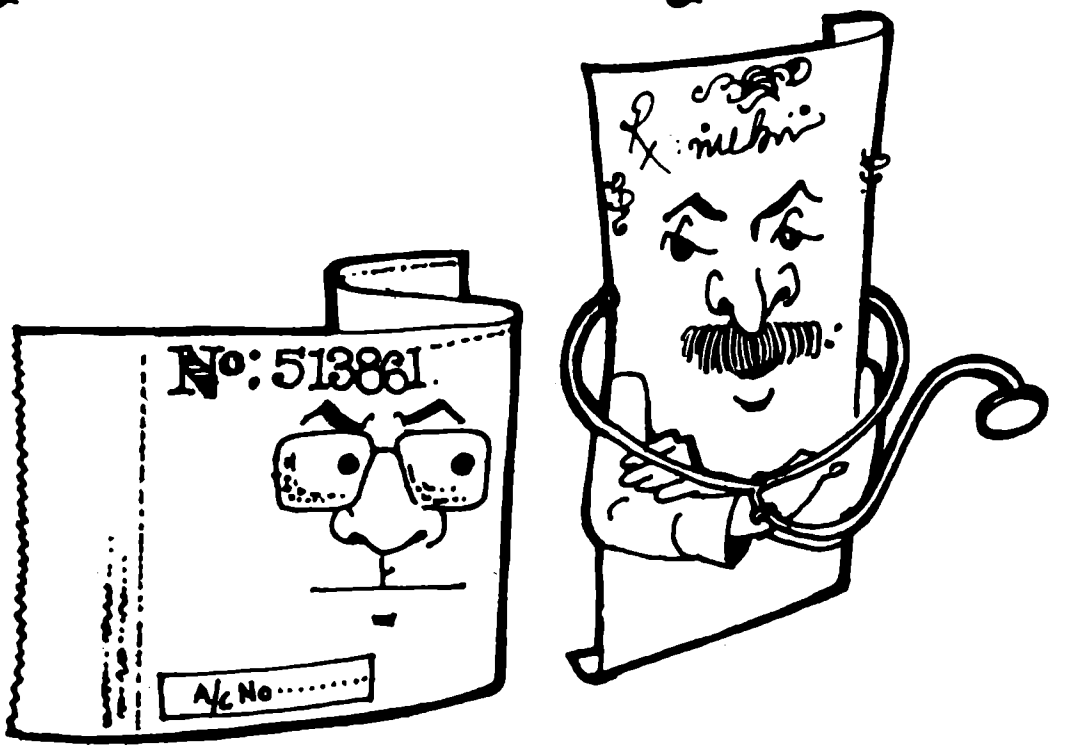

Chelpark

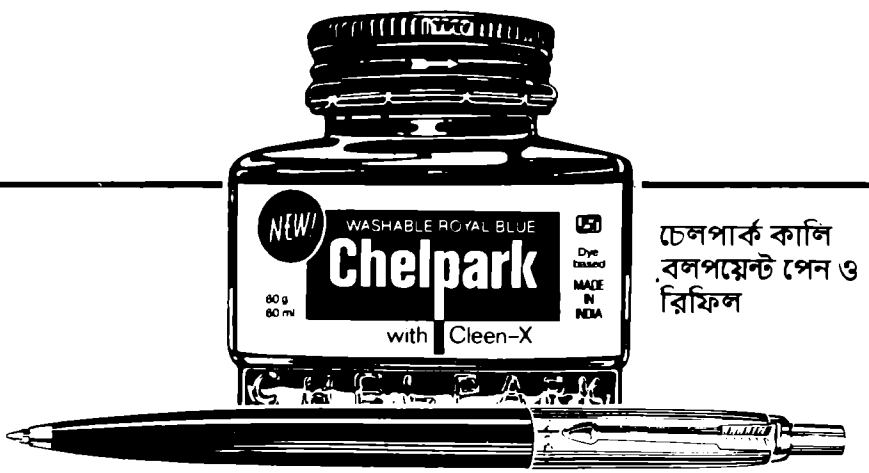

চেলপার্ক কালি
বলপয়েন্ট পেন ও
রিফিল

যে নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের আঙুলের ডগায়।

CCL-1654 C

Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

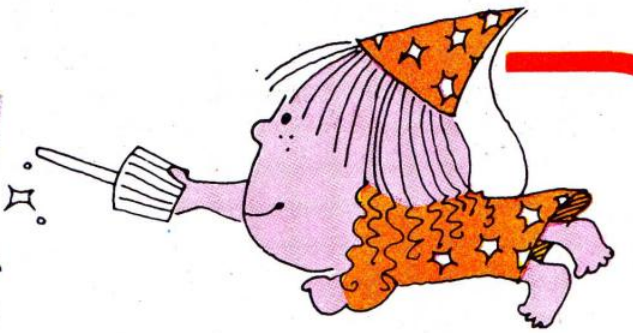

চটপট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

কিটি বেড়াল কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী" পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

কিটি বেড়াল কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

সহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট্ পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না (A)

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর ফেভিকল ব্রাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-4103 BEN